প্রথম অধ্যায়

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের ঐতিহাসিক, সামাজিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাস

ক) তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের একটি স্বতন্ত্র ধারা বর্তমান। কেননা, এ অঞ্চলে রয়েছে সমভূমি, অরণ্য এবং পর্বত। অন্যদিকে ভারতের মানব প্রজাতির সবকয়টি ধারা এই ভূ-খণ্ডের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তাই এতদঞ্চলকে আমরা ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে অভিহিত করতে পারি ।এখানে আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত, তা হল, এই ভূ-খণ্ডের দুই দিকে রয়েছে দুই প্রাচীন নদী (তিস্তা ও তোর্ষা) আর অন্য দিকে রয়েছে সুপ্রাচীন হিমালয় পর্বতমালা।

ভারত উপমহাদেশের এই অঞ্চলে আর্যদের আগে দ্রাবিড়গণ, তারও আগে অষ্ট্রিকেরা কৃষির বিকাশ ঘটিয়েছে। এমনকি মধ্য প্রস্তর যুগে ভারতে প্রথম অভ্যাগত মানবগোষ্ঠী নেগ্রিটোরাও এখানে পদচারণা করেছে। আবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদি প্রস্তর যুগে পিলেকান ফ্রোপাসগণ বিবর্তিত হয়ে হোমো ইরেকটাস বা পূর্ণ মানব বর্মা ও ভারতের মধ্য দিয়ে ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাপ্ত নির্দশন থেকে অনুমান করা যায়, আদি প্রস্তরযুগের প্রায়-মানবেরা উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে যাতায়াত করেছিল। কেননা, আদি প্রস্তরযুগের নির্দশন ভারতের যে চারটি অঞ্চলে আমরা পাই তা হল পাঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীর, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি থেকে ছোটনাগপুর অঞ্চল পর্যন্ত এবং উত্তরবঙ্গ ও অসমের পার্বত্যময় অরণ্য অঞ্চল। সারা উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে আদি, মধ্য ও নব্যপ্রস্তর যুগের নানা উপাদান ও নিদর্শন পাওয়া যায়।[১]

ঐতিহাসিক যুগের প্রথমেই অর্থাৎ ১০০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে ৭৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়ে নেগ্রিটো জাতি প্রবেশ করে। এরা আসে আফ্রিকা থেকে। এদের জীবিকা পশু শিকার ও অরণ্যের ফলমূল সংগ্রহ। জনসংখ্যার চাপে শিকারযোগ্য প্রাণীদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে ভারতে প্রবেশ করে। নেগ্রিটোগণ ভারতের পার্বত্যময় অঞ্চল ও মালভূমি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এদের একটি শাখা আরাবল্লী পর্বতমালা ঘুরে ছোটনাগপুর, রাজমহল হয়ে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। আরেকটি শাখা হিমালয়ের পার্বত্য পথে উত্তরবঙ্গে উপনীত হয়।[২]

নেগ্রিটোদের পর ৭৫০০ খ্রীঃ পূঃ কাছাকাছি সময়ে ভারতে প্রবেশ করে অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠী। এরা প্রথমে উত্তরবঙ্গে এসে পরে বাকি ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এরা ছিল যাযাবর শ্রেণি। পরবর্তী

সময়ে অর্থাৎ আনুমানিক ৫০০০ থেকে ৪৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে এরা চাষবাস শেখে তার পরেই গড়ে তোলে স্থায়ী আবাস ও গ্রামীণ সংস্কৃতি।[৩]

খ্রীষ্ট পূর্ব ২০০০ বছর আগে বর্মা সীমান্ত ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা ধরে অসম ও প্রান্তিক উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে মঙ্গোলীয় জাতি প্রবাহ। এদের আরেকটি শাখা তিব্বত হয়ে নেপাল, সিকিম ও ভূটানের পথে উত্তর ভারত ও উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। এরাই কিরাত নামে পরিচিত হয়। প্রান্তিক উত্তরবঙ্গ ও অসমের রাজনীতি, সমাজ গঠন, ভাষাভঙ্গি ও সংস্কৃতি মঙ্গোলিয় গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ দান।[৪]

এদের পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে আলপানীয় নরগোষ্ঠীর আলপানীয়, দিনারিক ও আর্মেনীয় এই তিনটি শাখা ভারত তথা উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। এরা এসেছিল মধ্য এশিয়ার পাবর্ত্য ভূমি থেকে। এদের মধ্যে দিনারিক নরগোষ্ঠীর প্রভাব বাঙালীদের মধ্যে সর্বাধিক ছিল।[৫] তবে পরবর্তী কালে এদের প্রভাব ততটা লক্ষ্য করা যায় না। এর কারণ বোধ হয় মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড় এবং তৎপরবর্তী কালে আর্যদের সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কিত গভীর প্রভাব।

খ্রীষ্ট-পূর্ব ৪৫০০ বছর বা তার কাছাকাছি সময়ে ভারতে প্রবেশ দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর, এদের তিনটি ধারা, প্রথম ধারাটি ছিল মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন, কৃষ্ণকায় ও লঘু শরীর, এদের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল মূলতঃ দক্ষিণ ভারত। ৩৭০০ খ্রিষ্ট পূর্বে পশ্চিম ও মধ্য ভারতে যে দ্রাবিড় গোষ্ঠী প্রবেশ করে তারা ছিল দীর্ঘ, উজ্জ্বল বর্ণ ও দৃঢ় গঠন। আরও পরে পূর্ব ভারতে ও রাজপুতানা, পঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর প্রদেশে প্রবেশ করে আরেকটি ধারা, যাদের উন্নত নাক, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘাকৃতি গঠন ছিল। পূর্ববর্তী অষ্ট্রিকগোষ্ঠী যেমন ছিল কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার বাহক তেমনি তার ঠিক উল্টো ছিল দ্রাবিড়গোষ্ঠী। দ্রাবিড়রা নাগরিক সভ্যতা ও রাষ্ট্রশক্তির বিকাশ ঘটিয়েছিল দক্ষিণ ভারত তথা সিংহলে, মধ্য ভারতে, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পায়।[৬]

খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করে এখানে তাদের প্রথম উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। প্রবেশ করেই আর্যগণ যে যে রাজশক্তির পরিচয় পেয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুণ্ড্রবর্ধন। বাংলার প্রাচীনতম রাজতন্ত্র পুণ্ড্রবর্ধন এই উত্তরবঙ্গের মাটিতেই গড়ে উঠেছিল। শক্তিশালী রাষ্ট্র ও নগর সভ্যতা পুণ্ড্রবর্ধন রাজতন্ত্র শতাব্দীর পর শতাব্দী আর্য সাম্রাজ্যবাদকে পূর্ব ভারতে প্রতিহত করে রেখেছিল। এরা 'দস্যু' জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল। যার আদি অর্থ দেশীয় জাতি। আর্যগণ সমগ্র ভারতে রাজ্যবিস্তার করতে পারলেও পুণ্ড্রবর্ধনদের কাছে তথা উত্তরবঙ্গে প্রতিহত হয়, স্বাধীন পুণ্ড্রবর্ধন খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৩২০ অব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পত্তন পর্যন্ত স্থির ছিল। পরবর্তী

সময়ে কণিষ্ক থেকে কিরাত বংশোদ্ভূত অহমরাজ পর্যন্ত অনেক অনার্য শাসন ব্যবস্থাই আর্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম করে গেলেও আর্যদের ভাষা, ধর্ম, সামাজিকতা সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল। এর অন্যতম কারণ অনার্যগণের ক্ষত্রিয় বলে স্বীকৃতি পাওয়ায় সচেষ্ট হওয়া।[৭]

ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে[৮] আমাদের জীবনের প্রাচীন অধিবাসীদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পরবর্তী ঐতিহাসিক কালের ফলশ্রুতি। কিন্তু ভারতবর্ষের জনপ্রবাহে গভীরভাবে এর স্পর্শ কোথাও না লাগলেও কোনো কোনো অংশের লোকজীবনে তার প্রভাব দেখতে পেয়েছেন। মঙ্গোলীয় রক্ত ধারায় একদিকে তিনি দেখেছেন আসাম, উত্তরে নেপাল-ভূটান এবং পূর্ব প্রান্তে ব্রহ্মদেশশায়ী প্রত্যন্ত জনপদ ও অরণ্যবাসী লোকেদের মধ্যে। উত্তরে হিমালয় সানুদেশবাসী লিম্বু-লেপচা-রংপা প্রভৃতি রকমের লোকদের তিব্বতি রক্তধারা তাঁর কাছে সুস্পষ্ট। এঁরা উত্তরবাংলার অধিবাসীদেরই অংশভুক্ত। আবার আসামের উত্তর ও পূর্ব প্রান্তশায়ী যে পৃথক মঙ্গোলীয় রক্তধারা তার পরিচয় তিনি দেখেছেন অন্যান্য অনেক দেশের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপূর্ব আসাম এবং রংপুর, কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ি অঞ্চলে। তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চল অর্থাৎ কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষেত্রে সমাজগঠন চিত্র একটু আলাদা। প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে এই অঞ্চল কামরূপ-কামতাপুর ও কুচবিহার নামে শাসিত হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম ডুয়ার্স অঞ্চল কুচবিহার -এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুচবিহার শাসনের দুর্বলতার সুযোগে এই পশ্চিম ডুয়ার্স অঞ্চল আবার ভূটানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একসময় ভূটানীরা কোচ রাজা ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণকে বন্দী করে ভূটান নিয়ে যায়। এই অবস্থায় নাজীরদেও কোন উপায় না পেয়ে ইংরেজদের শরণাপন্ন হয় এবং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সময় থেকেই কুচবিহার তাঁর সার্বভৌমত্ব হারায় অর্থাৎ কুচবিহার ইংরেজদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। ইংরেজ ও ভূটানীদের মধ্যে প্রথম ঈঙ্গ-ভূটান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ক্যাপ্টেন জোনস্ একদল সৈন্যসহ এসে ভূটিয়াদের যুদ্ধে পরাজিত করে হটিয়ে দেন। অবস্থা দেখে ভূটানরাজ ভীত হন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করে মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ও তার সঙ্গীদের মুক্তি দেন।[৯] যে স্থানে ভূটানরাজের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি হয় সেই স্থানের নাম 'রাজাভাতখাওয়া' যা আলিপুরদুয়ারের নিকটবর্তী অঞ্চলে অতীত স্মৃতি নিয়ে আজও বেঁচে আছে।

এই ঘটনার পরেও পশ্চিম ডুয়ার্সের উপর ভূটানের আধিপত্য থেকেই যায়। ভূটানীরা যখন তখন কোচরাজ্যের অভ্যন্তরে এসে লুটপাট চালাত, আক্রমণ করত। কোচরাজারা ভূটানীদের এই দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে পারেননি। ইংরেজরাও এব্যাপারে নীরব ছিল; কারণ তারা ভূটানীদের

চটাতে চাইছিল না, যেহেতু তাদের তিব্বতের সাথে ব্যবসায়িক স্বার্থ ছিল এবং তা হ'ত ভূটানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ভূটানীদের বাড়বাড়ন্ত বেড়েই যাচ্ছিল এবং ইংরেজদের ধৈর্য্যের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় ১৮৬৩ সালে ইডেন সাহেবকে আলোচনার জন্য ১৮৬৩ সালে ভূটানের রাজদরবারে পাঠানো হয়। কিন্তু ভূটানের রাজদরবারে ইডেনকে ভীষণভাবে অপমান করা হয় এবং জোর করে তাকে এক সন্ধিতে স্বাক্ষর করাতে বাধ্য করে, যা ছিল ইংরেজদের পক্ষে খুবই অপমানকর। এই অবস্থায় ইংরেজরা ভূটানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং শুরু হয় দ্বিতীয় ঈঙ্গ -ভূটান যুদ্ধ।[১০] ১৮৬৫ সালে 'সিঞ্চুলা চুক্তির' মাধ্যমে এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। ১৮৬৫ সালে পশ্চিম ডুয়ার্স অঞ্চল দখল করার পর কয়েক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৬৯ সালে জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হয়। এ সম্পর্কে জলপাইগুড়ি District Gazzeteer এ উল্লেখ আছে - 'The district so formed in 1869 is bounded in the north by Darjeeling district and Bhutan, in the east by Assam in the south by Rangpur district in Bangladesh and Koch Bihar district and in the west by Darjeeling district and part of Bangaladesh. The respective areas of the two subdivisions of the district, sadar and Alipur Duars, have varied from decade to decade.[১১]

বাংলার উত্তরাংশের সমাজগঠনের ইতিহাস একটু আলাদা এই অর্থে যে, এখানে বাংলার অন্যান্য অংশের মত প্রাগ্ আর্য ও প্রাগ্ দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষই শুধু সভ্যতার বিকাশ ঘটায়নি। প্রাগ্ দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ ছাড়াও এই অঞ্চলের বৃহৎ অংশ জুড়ে মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর মানুষ সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল এবং ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠী মানুষের আধিপত্য ছিল প্রখর। অবশ্য পরবর্তীকালে অস্ট্রোলয়েড, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর মানুষের মিশ্রণের ফলে নতুন নতুন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিভিন্ন উপাদান থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বেই তিব্বত হতে বোদ প্রজাতির মানুষ এসে বর্তমান ডুয়ার্স অঞ্চলে এবং নেপাল পর্যন্ত বসবাস শুরু করে। এরাই পরবর্তীকালে কোচ, মেচ, গারো, রাভা, টোটো, ধীমাল, থারু, লেপচা প্রভৃতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। খ্রীষ্টের জন্মের হাজার বছর আগে থেকেই পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে আর্য সংস্কৃতির মিশ্রণ অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধীরে ধীরে সংগঠিত হচ্ছিল এতদ্অঞ্চলে এবং এই সময় থেকেই তিব্বত থেকে একটি জনজাতি এসে হিমালয়ের পাদদেশে স্থায়িভাবে বাস করতে শুরু করে। যজু এবং অথর্ববেদে এদেরকে কিরাত বলা হয়েছে।[১২] একথা ঐতিহাসিক সত্য যে তিব্বতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে সেখান থেকে লোকেরা নাথুলা গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। এরা 'বদ' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। 'বদ্' থেকেই 'বদো'

বা 'বড়ো' শব্দটি এসেছে বলে অনুমান। বদোদের মেচে, কোচে, লাপচে, লিম্বু এবং বরাই নামে পাঁচ ভাই।[১৩] মেচের সঙ্গে যারা ভারতীয় ভূখণ্ডে এসেছিল তারা মেচ নামে পরিচিত হল। এই মেচরা যে নদীর ধারে বাস করত সেই নদীর নামই হল মেচী নদী। কোচের সাথে যারা এলো তারা কোচ নামে পরিচিত হল। অন্যদিকে বদো বা বড়োদের একটি শাখা পূর্বদিক দিয়ে পাটকই পর্বত পার করে ভারতে প্রবেশ করে এবং অসম হয়ে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। এ প্রসঙ্গে ড. চারুচন্দ্র সান্যাল লিখেছেন — Such was the history of a Tibeto-Barman speaking Indo-Mongoloid tribe, the Bodos, who migrated into India through patkoi Hills between India and Burma and gradually spread themselves into the whole of modern Assam, North Bengal and parts of East Bengal. The ruled over these tracts of land for many years. It is probable that they marched towards three directions. One part went south upto kachar and were called Kacharis, The second part went along the river Brahmaputra and established themselves in the whole of modern Assam upto Goalpara and parts of Jalpaiguri and Cooch-Behar under the name boro or bara.[১৪]

উত্তরবঙ্গে কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা বহু প্রাচীন কাল থেকেই নানান ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা সমৃদ্ধ। অবিভক্ত বাংলার যে ভূ-ভাগ গঙ্গা নদীর উত্তর প্রান্তে এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পারে অবস্থিত সাধারণভাবে এই ভূ-ভাগকে উত্তরবঙ্গ বলা হয়। এখানে মিলন ঘটেছে সমতলের মানুষের সঙ্গে পাহাড়ি মানুষের। মিলন ঘটেছে বিচিত্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে, মেচ, রাভা, গারো, কোচ, ওরাওঁ, মুণ্ডা, নাগোশিয়া, ভুটিয়া, লেপচা, দ্রুকপা, চাক্‌মা, শেরপা, হাজং, টোটো, সাঁওতাল, বর্ণহিন্দু, মুসলিম, রাজবংশী আরো বিচিত্র জনজাতি, জাতি, উপজাতি নিয়ে উত্তরবঙ্গের মানুষের সামগ্রিক পরিচয় গড়ে উঠেছে। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে মহাভারতের বর্ণিত ভগদত্তের রাজ্যের কিছু অংশ বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। In the Mahabharata (the historical basis of which goes back to the 10^{th} century B.C., according to F.E. pargiter, H.C. Ray Chaudhury and L.D. Barnett), there is the mention of a king named Bhagadatta. he was the king of Pragjyotisha or Western Assam. He joined the battle of Kurukshetra on the side of the Kouravas with his army of Chinese and Kirata Soldiers. In the Mahabharata, Bhagadatta has been described as a king of the mlechchhas

or non-Hindu barbarians.[১৫] যাইহোক, তিস্তা বিধৌত জলপাইগুড়ি জেলা ১৮৫৪ সালে তৎকালীন রংপুর জেলার একটি মহকুমা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং অবশেষে ১৮৬৯ সালের ১লা জানুয়ারি পূর্ণ জেলার মর্যাদা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে জেলার সীমানার আবার রদবদল হলে এর গুরুত্ব বা মর্যাদা এতটুকু কমেনি। ১৯৬৩ সালের ৪ মার্চ উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা নিয়ে গঠিত হয় জলপাইগুড়ি বিভাগ এবং জেলা সদরই এই বিভাগের শাসন কেন্দ্র। অন্যদিকে তোর্ষা বিধৌত কুচবিহার ভূখণ্ডটি ১৯৫১ সালের ১লা জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক জেলা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত ইংরেজদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হলেও এই করদ মিত্র রাজ্যের চূড়ান্ত ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তারপর ১৯৪৭ সালের ২৮ শে আগষ্ট কুচবিহারের মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এবং ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের ঘোষণার মাধ্যমে কুচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রান্তিক জেলা রূপে স্বীকৃতি পায়। এ ভাবেই কুচবিহারে ৪৫০ বছরের একটি রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটে।

খ) তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের অক্ষাংশ ২৫°৫৭´৪০´´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৭°৫´ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত। দ্রাঘিমাংশ ৮৮°০৪´ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৮৯°৫৪´ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত। জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা অর্থাৎ তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ৬৮৮০৩২৮ জন (২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী)। পুরুষ ৩০২৩২৩৯ জন, মহিলা ৩৮৫৭০৮৯ জন। আয়তন ৯৬১৪ বর্গকিলোমিটার। এতদঞ্চলের সীমানা উত্তরে দার্জিলিং ও ভূটান, পূর্বে অসম, দক্ষিণে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমে দার্জিলিং জেলা ও বাংলাদেশ।

ভূ-প্রকৃতি ঃ

ভূ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন — এতদঞ্চলের দক্ষিণ অংশে তরুণ পলিমাটি দিয়ে গড়া সমতল ভূমি। এর ঠিক উত্তরে রয়েছে পাহাড়তলি বা উপত্যকা যা রুক্ষ বালি ও নুড়ি পাথরের সমন্বয়ে গঠিত। আর একেবারে উত্তরে ও উত্তর পূর্বে রয়েছে দার্জিলিং ও ভারত-ভূটান সীমানা বরাবর দক্ষিণ হিমালয়ের অনুচ্চ প্রস্তরময় পাহাড়ী বন্ধুরতা যা এখানকার বিস্তীর্ণ সমভূমির পাশে এক দর্শনীয় ব্যতিক্রম। এতদঞ্চলের সমগ্র ভূ-খণ্ডের এই অংশই সবচেয়ে প্রাচীন এবং হিমালয়ের উত্থানের বহু আগেই স্তরীভূত ও রূপান্তরিত হয়েছিল।

বর্তমান ভূমিরূপ প্রাচীন শিলাস্তরের পরে নদী, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানের প্রভাবে ক্ষয় সাধনের ফলে উদ্ভূত। ভূ-তাত্ত্বিক সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে এই অঞ্চলের উত্তর-পূর্ব সীমানা প্রাচীন কঠিন শিলাস্তরের একটি সরু ফালি আছে। দক্ষিণের নদী গঠিত সমভূমি থেকে উচ্চতা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে বক্সা জয়ন্তী অঞ্চলে প্রায় ২০০০ মিটার এবং এর উত্তরে উচ্চতা আরো বেড়েছে।[১৬] পাহাড়ের ঢাল এখানে অত্যন্ত খাড়া ও ভূমিভাগ এবড়ো খেবড়ো এবং বন্ধুর। দক্ষিণের সমভূমি এলাকায় উচ্চতা সামান্য এবং সবটাই নদীবাহিত পলি দিয়ে গঠিত। অসংখ্য নদ-নদী সমতল এই ক্ষেত্রকে খণ্ডে খণ্ডে পৃথক করেছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এতদঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গঠন স্বতন্ত্র। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায় ৭০০ কিমি উত্তরে অবস্থিত এতদঞ্চল সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় ৫৭ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। হিমালয় থেকে নেমে আসা নদী বাহিত পলিবালি সঞ্চয়ে গঠিত মাটি গভীর প্রায় ১০০০-১৫০০ মিটার।[১৭] এর নিচে রয়েছে প্রাচীন আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা। মাটি হালকা প্রকৃতির, মাটিতে বালির ভাগ বেশি তাই

জলধারণ ক্ষমতা কম। তাছাড়া মাটি কিছুটা অম্লধর্মী। এখানকার ভূমিরূপের ঢাল উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত। বক্সা অঞ্চল ও ভুটান সীমান্ত ছাড়া এই অঞ্চলের সম্পূর্ণটাই পলিমাটি দিয়ে ঢাকা, কেবলমাত্র উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি সংকীর্ণ অংশে শক্ত পাথর পাওয়া যায়। ভূ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যে সব পাথর ও অবক্ষেপিত স্তর এই অঞ্চলে রয়েছে তার বিবরণ নিচের সারণীতে[১৮] সাজিয়ে দেওয়া হল ক্রমবর্ধমান প্রাচীনত্বের ভিত্তিতে —

ভূ-তাত্ত্বিক কাল	ঃ	ভূ-তাত্ত্বিক স্তর।
আধুনিক এবং প্রাগ্ আধুনিককাল	ঃ	বালু ও পলিমাটির স্তর, নুড়ি ও গণ্ডশিলার স্তর।
মায়োসিন কাল	ঃ	বেলেপাথর, কাদাপাথর ও লিগনাইট।
পারমিয়ান কাল	ঃ	বেলেপাথর, কাদাপাথর ও কয়লা।
প্রি-কেমব্রিয়ান কাল	ঃ	শ্লেট, শিষ্ট, ফিলাইট, কোয়ার্টজাইট, ডলোমাইট, এবং স্তরীভূত লৌহ আকর।

ভূ-তাত্ত্বিক বিবর্তন, অত্যাধিক চাপ ও তাপের প্রবাহে এই সব শিলায় রূপান্তর ঘটেছে। যার মধ্যে শ্লেট, শিষ্ট, কোয়ার্টজাইট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার উল্লেখযোগ্য পাললিক শিলাস্তরের মধ্যে বেলেপাথর ও কাদামাটি প্রধান। পাহাড়তলি অঞ্চলে নদীবাহিত বড় বড় পাথরের চাঁই ও নুড়ি সঞ্চিত আছে। ভূ-তাত্ত্বিক সময়ানুযায়ী এগুলি খুবই নবীন। পাহাড়ী অঞ্চল থেকে যত দক্ষিণ সমভূমির দিকে অগ্রসর হয়েছে ততই বড় নুড়ি ছোট হতে হতে বালি কণা ও শেষে সূক্ষ্ম পলিমাটিতে পরিণত হয়েছে। এই পলিমাটি সবটাই নদীবাহিত ও অত্যন্ত উর্বর। পাহাড়ী অঞ্চলে মাটিতে বালুকণা বেশি থাকায় চা-গাছের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কোথাও কোথাও মাটিতে নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থের ভাগ কম লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণের পলিসমৃদ্ধ উর্ব্বর সমভূমি কৃষির পক্ষে সহায়ক। তিস্তা, জলঢাকা, তোর্ষা ও মানসাই নদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মাটি তামাক, পাট ও ধান চাষে খুবই উপযোগী। সম্প্রতি কৃষি কাজের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনের দিকেও উৎসাহিত হতে দেখা যায়। তার মধ্যে গবাদি পশু, শূকর, হাঁস ও মুরগি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

খনিজ পদার্থ ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের প্রধান খনিজ পদার্থ হল ডলোমাইট। যে সব খনিজ পদার্থ এই অঞ্চলে পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তামার আকর ও চুনা পাথর। জয়ন্তী

বক্সা অঞ্চলে রয়েছে ডলোমাইটের বিশাল ভাণ্ডার, আনুমানিক ৩০০ লক্ষ টন ডলোমাইট রয়েছে এখানে।[১৯] জয়ন্তী ডলোমাইট হালকা ছাই রং-এর দানাদার পাথর। এছাড়াও কৃষ্ণবর্ণের এবং সাদা ডলোমাইটও সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। ডলোমাইট প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় চুন তৈরির কাজে এবং জমিতে দেওয়ার জন্য। ডলোমাইট থেকে উত্তরবঙ্গে বিশেষতঃ তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে শিল্প সম্ভাবনা আছে। সিমেন্ট ও ঔষধ শিল্প এর মধ্যে প্রধান। জেলায় খনিজের মধ্যে কয়লার কথাও বলতে হয়। জেলায় উত্তরপ্রান্তে বাগরাকোট ও মালের কাছে পাহাড়ের সানুদেশে কয়েকটি পাতলা ভঙ্গুর স্তরের আকারে যে কয়লা পাওয়া যায় তা প্রায় পঁচিশ থেকে কুড়ি কোটি বছর আগের।[২০] এই কয়লা চা-কারখানা ও কাঠের ফলে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বক্সাবাজারের কাছে নিম্নমানের আকরিক লোহার ভাণ্ডার আছে। যদিও তাতে লোহার পরিমাণ খুবই কম মাত্র তিরিশ শতাংশ। তবে ভবিষ্যতে এখানে লোহার ভাণ্ডার গড়ে উঠার সম্ভাবনা আছে বলা যায়।

জলবায়ু ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের জলবায়ু সাধারণতঃ আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি এবং তাপমাত্রা নাতিশীতোষ্ণ হয়। তবে এতদঞ্চলে পশ্চিমাংশের তুলনায় পূর্বাংশে তাপমাত্রা একটু বেশি থাকে। জুন মাস থেকে অক্টোবর মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাব থাকে। অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তর মরসুম চলে। নভেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত চলে শীতকাল এবং মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। জানুয়ারি হল এতদঞ্চলের শীতলতম মাস। এইসময় তাপমাত্রা ১০.৫° থেকে ২৪° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। মার্চ মাস থেকে ক্রমশঃ তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। এপ্রিল ও মে মাসে বেড়ে হয় ৩২.০৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এ পর্যন্ত রেকর্ড করা হিসেব অনুযায়ী সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩.৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হল ৪০.০ ডিগ্রি সেন্টেগ্রেড। ভৌগোলিক অবস্থান বিচারে জেলাটি কর্কটক্রান্তি রেখার উত্তরে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অধীন হলেও জলবায়ু আর্দ্র প্রকৃতির। বাতাসের আর্দ্রতা শতকরা ৭০ ভাগ। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৪০ সেন্টিমিটার। বছরের প্রায় ১১০ - ১২০ দিন বৃষ্টি হয়। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত এই তিনটি প্রধান ঋতু। January is the coldest month with the mean daily minimum temperature at 10.7° c (51.3° F) and the mean daily maximum temperature at 23.6° C (74.5° F). April and May are the hottest months. The mean daily maximum temperature in these months is 31.6° C (82.9° F) and the mean daily minimum temperature is

21.3° C (70.3°F)... The highest maximum temperature recorded at Jalpaiguri was 40.0° C (104.0° F) in 1932, April 11.[২১]

এখানকার প্রাকৃতিক উদ্ভিদ জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত। প্রচুর বৃষ্টিপাত ও তাপ আধিক্যের ফলে আবহাওয়া উষ্ণ ও স্যাঁতস্যাতে যা কিনা চিরহরিৎ অরণ্যের উপযোগী। শাল, খয়ের, শিশু গাছ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আছে। মাটিতে বালুকণার ভাগ বেশি থাকায় জল দাঁড়ায় না। তবে দক্ষিণাংশে কিছু জলাভূমি আছে, যা কৃষিকাজের অনুকূল। মোট কৃষিযোগ্য জমি প্রায় ১৭৪৬৩৯৬ একর। এর বেশির ভাগ জমিতেই বছরে একাধিকবার চাষ হয়। এতদঞ্চলের দক্ষিণাংশে ফসল উৎপাদন ও চাষের হার খুব বেশি। বর্ষাকাল ছাড়া বছরের বাকি সময় বৃষ্টি কম হওয়ায় জমিতে জলসেচ করার প্রয়োজন হয়। এতদঞ্চলের অধিকাংশ জনগণই কৃষিকাজে নিয়োজিত। যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৯.৫ শতাংশ (২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী)। প্রায় ৪৫২৫২৯ একর এলাকা জুড়ে বনভূমি লক্ষ্য করা যায়। যা মোট ভৌগোলিক আয়তনের ২৮.৫৪ শতাংশ। এখানে যে সমস্ত জঙ্গ ল দেখা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে, শাল, সেগুন, শিশু, গামার, বাঁশ, বেত প্রভৃতি গাছের আধিক্য। বেশির ভাগ বনভূমিই সংরক্ষিত। জলদাপাড়া, গরুমারা, বৈকুণ্ঠপুর ও চাপরামারির অভয়ারণ্যে গণ্ডার, হাতি, বাঘ, চিতা ও অন্যান্য প্রাণী দেখা যায়। এছাড়া পাতলাখাওয়া, গোসানীমারী ইত্যাদি অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের বনও দেখা যায়। এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে বনজসম্পদের দান অপরিসীম।

নদ-নদী ঃ

জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা মূলতঃ নদীমাতৃক। জেলাদ্বয়ের অবস্থান যেহেতু হিমালয়ের পাদদেশে তাই স্বাভাবিকভাবেই ভূমির ঢাল উত্তর থেকে দক্ষিণে। ফলে জেলার নদীগুলিও প্রধানতঃ উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। পলিবাহিত এই নদীর অববাহিকাই দক্ষিণের সমভূমি অঞ্চলকে শস্যশ্যামলা করে তুলেছে। এতদঞ্চলের প্রধান নদীগুলির মধ্যে বেশির ভাগই হিমবাহ পুষ্ট। তাই সারা বছরই জল থাকে। আর যেগুলি কেবলমাত্র বৃষ্টির জলে পুষ্ট সেগুলিতে শীতকালে প্রায়ই জল থাকে না। ছোট ছোট ঝোরা ও নালা ব্যতীত এতদ্অঞ্চলে ৮০ টির বেশি নদী আছে।[২২] এখানকার মূল নদীগুলি হল তিস্তা, ধরলা, জলঢাকা, তোর্ষা, কালজানি, রায়ডাক বা সংকোশ, গদাধর এবং আরো কয়েকটি ছোট নদী।

তিস্তা ঃ

সিকিমের লাচেন ও লাচাঙ নামে দুটি হিমবাহ থেকে তিস্তার উৎপত্তি হয়ে কালিম্পংয়ে প্রবেশ করে। এরপর শিলিগুড়ির পাশে সেবক হয়ে জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায় প্রবেশ করে এবং হলদিবাড়ি দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের রংপুর জেলায় চিলমারি বন্দরের কাছে ব্রহ্মপুত্র নদে মিশেছে। এর মোট দৈর্ঘ্য ১৭২ মাইল। তিস্তার প্রায় ১২৫ কিমি পড়েছে উত্তরবঙ্গে। এর ডান তীরে ধরলা ব্যতীত অন্য কোন উপনদী নেই। লীস, গীস, ধরলা, খোনাই প্রভৃতি উপনদী বামতীরে মিলিত হয়ে একে আরও স্রোতস্বিনী করেছে। এই নদীর তীরে জলপাইগুড়ি, মেখলিগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ শহর গড়ে উঠেছে। এক সময় মেখলিগঞ্জ থেকে এই নদীর মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্য বিশেষ করে তামাক বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশে রপ্তানি হত। ওই সময় বাণিজ্য নৌকা চলাচলের জন্য কুচবিহার রাজ সরকার বাণিজ্যকর নিতেন। এতদ্অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিতে এই নদীর নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে।

জলঢাকা ঃ

১৬০ মাইল দৈর্ঘ্যের জলঢাকা নদী থেকে সিকিমের বিদংহ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মূর্তি, ডায়না, ডুডুয়া, কুমলাই, জিতি, শিপচু, ইনডং, মুজনাই প্রভৃতি উপনদী দ্বারা পুষ্ট হয়ে পশ্চিম ডুয়ার্স দিয়ে শৌলমারি হয়ে কুচবিহার জেলায় প্রবেশ করে। এই জেলায় কোথাও মানসাই, কোথাও সিঙ্গিমারি আবার কোথাও ধরলা নদী হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। চোখকাটা ঘাটের পর থেকে মুজনাই এর মোহনা থেকে জলঢাকা নাম পরিবর্তন করে মানসাই নামে পরিচিত হয়। মানসাই নামটি আবার বেশিদূর বিস্তৃত নয়। মাথাভাঙ্গা শহরকে চিরে সুটুঙ্গা নদী শহর মাথাভাঙ্গার পাশ দিয়ে মানসাই -এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এর কিছু দক্ষিণ পূর্বে মাঘফালার দক্ষিণে এবং শিবপুরের বড়ুয়া হাটের কাছে ধরলা নদী মানসাই -এর ডান তীরে এসে মিশেছে। এর তিন মাইল পর থেকে মানসাই -এর নাম হয় সিঙ্গিমারি এরপর গোসানীমারি মন্দিরের দক্ষিণ ভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সিতাই -এ প্রবেশ করার পর তোর্ষা নদীতে মিলিত হয় অবশেষে রংপুরে (বাংলাদেশ) প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে।

এই নদীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব কম নয়। শত শত জেলের জীবন জীবিকা এই নদীর সুস্বাদু বোরলি মাছ। সারা বছর বালি পাথর বিক্রি করে রয়ালটি বাবদ লাখ লাখ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা পড়ে। এর পলিসমৃদ্ধ অববাহিকা দুই জেলার খাদ্যশস্য জোগানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

তোর্ষা ঃ

তোর্ষা শব্দটি এসেছে ভূটানি শব্দ তয়োরোষা বা ক্ষুব্ধ জলরাশি শব্দ থেকে। তিব্বতের মীনচাপ পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূটান অতিক্রম করে সাধুরাম অঞ্চলের মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করে। রূপসাপাড়া, তোপাবাসা, হান্টুপাড়া, মাদারিহাট, সোনাপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পাতলাখাওয়া অঞ্চল দিয়ে কুচবিহার জেলায় প্রবেশ করে, পরে গীতালদহ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়েছে। এর মোট দৈর্ঘ্য ১৪৮ মাইল। হাসিমারার কাছে চরতোর্ষা ও শিলতোর্ষা নামে যে দুটি শাখায় বিভক্ত হয় তা তোর্ষারই শাখা নদী এবং ঘোকসাডাঙ্গার কাছে এদুটি শাখা পুনরায় মিলিত হয়। তোর্ষার উপনদী হল — হলং, হোটোনা, বাংগুড়ি, মুলুঙ্গি, কুলটি, গোলুন্দি প্রভৃতি। তোর্ষা নদী প্রচণ্ড খরস্রোতা, তাই বারবার গতি পরিবর্তন করেছে। বর্তমানে মাথাভাঙ্গার লাফাবাড়ি ও কুচবিহার সদরের বক্সীবস পুঁটিমারীর মধ্য দিয়ে দক্ষিণে বড়ভিট, কুচবিহার শহর, পানিশালার পাশ দিয়ে তুফানগঞ্জে প্রবেশ করেছে। এরপর তুফানগঞ্জে ঘড়ঘড়িয়া ও কালজানি নদী তোর্ষা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

এই নদীর দুই তীরে বহু সমৃদ্ধ শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র একসময় গড়ে উঠেছিল। তুফানগঞ্জ মহকুমার কালজানি ও তোর্ষা নদীর মিলনস্থলের বাম তীরে তুফানগঞ্জ বন্দর ও ডান তীরে কুচবিহার রাজ্যের নাজিরের বাসস্থান বলরামপুর অবস্থিত। ফি বছর বন্যায় নদীর দু'কূল ছাপিয়ে যায়। ফলে দু'তীরে জমি পলিতে ভরে যায়। যা কৃষি কাজের পক্ষে খুবই অনুকূল। একসময় এই নদী দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে নৌকায় ব্যবসা বাণিজ্য চলত।

কালজানি ঃ

17 DEC 2012

ভূটানের ডুঙ্গিনা পাহাড় থেকে এর উৎপত্তি। কালজানি নদীতে মূলতঃ দুটি জল ধারা মিলিত হয়। একটি ডিমা নদী ও অন্যটি আলাইকুড়ি। আলিপুরদুয়ারের নিকট পরোরপাড় গ্রামের নিকট মিলিত হয়েছে। এই মিলনস্থল থেকেই কালজানি নদী নামে পরিচিত। এর উপনদীগুলি হল পারের নদী, নিমতিঝোরা, কালাঝোরা, বুনিয়া নদী প্রভৃতি। আলিপুরদুয়ার থেকে দক্ষিণপূর্বে প্রবাহিত হয়ে কালজানি খোলটা গ্রামে প্রবেশ করেছে। বক্সার পূর্ব দিকে ভূটান পাহাড় থেকে জয়ন্তী নদী উত্তর থেকে পূর্বে প্রবাহিত হয়ে আমবাড়ি গ্রামে গদাধর নাম নিয়ে কালজানি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। এর মোহনায় প্রতি মার্চ মাসে অষ্টমী স্নানের মেলা বসে। পূর্ব খোলটায় আরোও দুটি জলধারা নুগ ও চেকো কালজানি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ভেলাপেটা গ্রামে চলে আসে।

241097

LIBRARY

এখানে কালজানির বামতীরে খাটাজানি বলে আর একটি জলধারা কালজানির সঙ্গে মিলিত হয়ে চিলাখানা, ঘড়ঘড়িয়া হয়ে পানিশালা গ্রামে প্রবেশ করে। এখানে তোর্ষা ও ঘড়ঘড়িয়া কালজানির সঙ্গে মিলিত হয়। এরপর কালজানি ছৌখুসি বলরামপুর হয়ে ধুবড়ি রোড অতিক্রম করে ছোটো লোচাফেলা দিয়ে রংপুরে (বাংলাদেশ) প্রবেশ করে।[২৩] এরপর ভিটার বাঁধের শিলখুড়ি গ্রামের মধ্য দিয়ে তিনমাইল প্রবাহিত হবার পর গতি পরিবর্তন করে আবার কুচবিহার জেলায় প্রবেশ করে এবং সংকোশ নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। এই দুই নদীর মিলিত প্রবাহ দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়।

নদীটি খরস্রোতা ও গভীর জলবহনে সক্ষম। উজানে প্রায় ৯০০ ফুট চওড়া ও ভাটিতে প্রায় ৬০০ ফুট চওড়া।[২৪] স্বাধীনতার পূর্বে বণিকেরা লবণ, চাল, মশলাপাতি এই নদীপথে আমদানি করত। এছাড়া বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য যেমন - পাট, তামাক, ধান, সরষে বীজ, তেল নদীপথে রপ্তানি করত। পূর্বে ভবানীগঞ্জ থানা কালজানি গ্রামে নদীর ডান দিকে ছিল। পরবর্তীকালে কুচবিহার শহরে স্থানান্তরিত হয়। তখন থেকেই কুচবিহার শহরের বাজারের নাম হয় ভবানীগঞ্জ বাজার।[২৫]

ধরলা নদী ঃ

ভূটানে এটি চিল নদী নামে পরিচিত। ভূটান পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিম ডুয়ার্স দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার জল্পেশ মন্দিরের পশ্চিম দিকে পবিত্র নদী হিসেবে প্রবাহিত হয়ে চেংমারির সঙ্গে পশ্চিম ডুয়ার্সের বিভাজন ঘটিয়েছে। এরপর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আঁকা-বাঁকা পথে প্রবাহিত হয়ে পানিশালা দিয়ে চ্যাংড়াবান্ধা বন্দরকে ডান দিকে রেখে নিজ তরফ মৌজার দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আবার জলপাইগুড়ি জেলার পাটগ্রামে প্রবেশ করেছে। এরপর বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডকে ডান দিকে রেখে মাথাভাঙ্গা মহকুমা মহিষমুড়িতে প্রবেশ করেছে। তারপর তেতুলের ছড়া, ময়নাতলি, রথেরডাঙ্গা হাট দিয়ে সরু আঁকা-বাঁকা পথে প্রবাহিত হয়ে শিবপুরে বড়ুয়া হাটে সিঙ্গিমারি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এতদঞ্চলের লোকগানে ধরলা নদীর প্রসঙ্গ পাই।

রায়ডাক ঃ

ভূটান ও তিব্বতের সন্ধিস্থলে টাকাফু কুমফু শৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন জলপাইগুড়ি জেলার ভূটান ঘাটে এসে রায়ডাক নাম ধারণ করে চেংমারী, পাঁচকোড়া পাড়া, কাতারাম, কামাখ্যাগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে কুচবিহার জেলায় প্রবেশ করে। এই নদী টিয়ামারীর কাছে ১নং রায়ডাক ও ২নং রায়ডাক এই দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। ২নং রায়ডাক ধওলা, তুরতুরী, ধারসী

প্রভৃতি ছোট নদীর জলধারায় পুষ্ট হয়ে সংকোশে পড়েছে। কুলকুলি ও ঘোড়ামারা রায়ডাকের দুটি প্রধান উপনদী। ১নং রায়ডাক কুচবিহারের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কুচবিহার জেলায় তুফানগঞ্জ মহকুমায় রায়ডাক আবার তিনটি নামে পরিচিত — দীপা রায়ডাক, মরা রায়ডাক ও রায়ডাক। দীপা রায়ডাক রায়ডাকের একটি উপনদী। পূর্বে রায়ডাক নদীর তীরে অবস্থিত ফুলবাড়ির সঙ্গে বাংলাদেশে বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ ও ঢাকার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য চলত।

সংকোশ ঃ

ভূটানের কাশীথাং পাহাড় থেকে উৎসারিত হয়ে জলপাইগুড়ি জেলার পূর্ব প্রান্ত নিউল্যাণ্ড, পোখরি গাঁও, হলদিবাড়ি, বালাপাড়া, নয়াবাড়ি, ভল্কা, জোড়াই, মাঝের ডাবরি প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে আসামের গোয়ালপাড়া জেলার পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের কুড়িগ্রামের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদে মিলিত হয়েছে। ২নং রায়ডাক ও বেথুয়া এর প্রধান উপনদী।

গদাধর ঃ

বক্সাদুয়ার ছোট সিঞ্চুলা পাহাড়ের পামুসে চুড়া হতে উৎপন্ন হয়ে জয়ন্তী, চুনিফাঝোড়া, সলসলাবাড়ি, সাউথপাড়া, কার্জীপাড়া হয়ে কুচবিহার জেলায় উত্তর দিক থেকে ঘোগারকুটির অন্তর্গত লাউকুটি রাস্তা অতিক্রম করে প্রবেশ করে। এরপর দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে ধুবড়ির রাস্তা ধরে পূর্ব ও দক্ষিণে এক মাইল গিয়ে গাইবাড়ি দিয়ে রংপুর জেলায় প্রবেশ করে ও সংকোশ নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। গদাধরের উত্তর ভাগকে ধেরসি এবং মোহনায় দিকের অংশকে খোরা বলা হয়। গদাধর নামটি সম্প্রতি চালু হয়েছে।[২৬] এটি কালজানির একটি উপনদী। মূলতঃ গদাধর ও কালজানির মিলিত প্রবাহই সংকোশ নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। দাউদখান, জোড়াই, টাকুলা এই নদীগুলি গদাধরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

ডুডুয়া ঃ

পশ্চিম ডুয়ার্সের বিন্নাগুড়ি অঞ্চলে কতগুলি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহ বা জলধারা যেমন, কুল্লুয়া, আংরাভাটা, ইচা, গয়েরখুটা, গারতলী, নোসাই ইত্যাদি মিলিত রূপ ডুডুয়া নদী। এটি একটি মাঝারি মাপের নদী। প্রায় ২০০ গজ চওড়া। জোড়াপানী ও বালাসুন্দর অঞ্চল অতিক্রম করার পর কুচবিহার জেলায় সিঙ্গিজানি গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জলঢাকার সঙ্গে মিলিত

হয়েছে।

আলোচ্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিচয় ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে মৌসুমী জলবায়ুর দ্বারা বৃষ্টিপাত হয়। এতদঞ্চলের উত্তরাংশে পাহাড়ের চরিত্র থাকলেও নিচের দিকে আস্তে আস্তে তা সমতলের রূপ নিয়েছে। তিস্তা ও তোর্ষা বিধৌত উর্বর পলি মাটি সমৃদ্ধ সমতলভূমি যা কৃষিবলয় নামে পরিচিত। এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। মোটামুটিভাবে বলা যায় এখানকার মাটি কৃষির উপযোগী। বিভিন্ন ধরনের গাছ-গাছালি পশু পাখি, ফুল, ফল ও শস্যাদি রয়েছে। তবে সবরকম ফসল আলোচ্য অঞ্চলের সর্বত্র হয় না। আলোচ্য অঞ্চলের দক্ষিণ পূর্বাংশে অর্থাৎ মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা, শীতলখুচীতে যে পরিমাণ তামাক ও পাট উৎপাদন হয় তা উত্তর-পূর্বাংশে বা উত্তর-পশ্চিমাংশে তেমন হয় না। অবশ্য সর্বত্র কৃষি উৎপাদনের একটা প্রয়াস চলছে। যাইহোক, বর্তমানে আলোচ্য অঞ্চলে রয়েছে এমন সব বৃক্ষ-লতা-শস্যাদি এবং পশু-পাখি-মাছাদির নাম উল্লেখ করা হল ঃ

ফুল ঃ

অপরাজিতা, অশোক, আকন্দ, কলকে, কলাফুল, কৃষ্ণচূড়া, কলমী, কামিনী, কাঞ্চন, খয়ের, সর্পগন্ধা, কেতকী, গন্ধরাজ, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, চাঁপা, জবা, জুঁই, টগর, পদ্ম (ময়লানী), পলাশ, বনফুল, বকুল, বেল, মোরগঝুঁটি, নাগকেশর, রক্তজবা, রাধাচূড়া, শালুক, শিউলি, শেফালি, সন্ধ্যাতারা, সূর্যমুখী, ধুতরা, স্থলপদ্ম, বকফুল, তারাফুল, সন্ধ্যামালতি, নাইন-টুয়েলভ্, নাইটকুইন্, কলাবতী, ধুলপি, দোপাটি, ভাউটি ফুল, মাদার ফুল ইত্যাদি।

ফল ঃ

আতা, আম, কাঁচামিঠা আম, কলা, আঁটিয়া কলা, মালভোগ কলা, চম্পা কলা, মধুয়া কলা, মানিক কলা, দখিনা কলা,আনাজী কলা, কাঁঠাল, আনারস, কামরাঙা, পানিয়াল, সবেদা, তরমুজ, তাল, কমলা, খিরা (শসা), খেজুর, গোলাপ জাম, নটকো, ডালিম, ডুমুর, জাম, জামরুল, পেয়ারা, বোগরি বা কুল, পানিফল (নিক্‌না), বেল, খিরা, তেতুল, তরমুজ, চালতা, জম্বুরা বা বাতাবি লেবু, পেঁপে, মনুয়া কলা, চিনিয়া কলা (চিনিচাম্পা), ছোট কুল (বনবগুড়ি), বল্লাগুটা সুপারি ইত্যাদি।

মূল ঃ

আদা, হলুদ, বার্লি, রসুন, পেয়াজ, শতমূল, শাঁকালু, ওল, কাঠ আলু, মিষ্টি আলু বা রাঙা আলু ইত্যাদি।

বৃক্ষ ঃ

শিমূল, শিশু, শাল, সেগুন, বন কাঠালি, পয়া, শিরীষ, মেহগিনি, বট, পাকুড়, নিম, জগডম্বুরা, কদম, ঝাউ, ঘোড়া নিম, সর্পগন্ধা, অর্জুন, খয়ের, জিগা, মাদার, আম, জাম, কাঁঠাল, আকাশমণি, ছাতিম, শেওড়া, জামরুল ইত্যাদি।

বাঁশ ঃ

বড়ো বাঁশ, মাকলা বাঁশ, জাওটা বাঁশ, বেরু বাঁশ, নল বাঁশ ইত্যাদি।

লতা ও গুল্মাদি ঃ

অনন্তমূল, আকন্দ, বাঁশফুল, তুলসি, সজিনা, হেলেঞ্চা, গন্ধভাদালি, পাথরকুচি, কালমেঘ, স্বর্ণলতা, রাম তুলসি, হাড়ভাঙা বা হাড়জুড়া, পুদিন, পিপুল, পাথরকুচি বাসক, চিরতা, সিঙ্কোনা, চন্দন, অশ্বগন্ধা, থানকুনি পাতা, পুনর্ণভা, গুলঞ্চ,চাকোড় বা চাকোন্দা, রাংচিতা, লজ্জাবতী, বিশল্যকরনি, নিশিন্দা, বিছুটিপাতা, ভেরেন্ডা, গোলমরিচ, নাগকেশর, শুশনি (সুষমি), শ্যামালতা, দুধিয়া লতা, খুড়িয়া, কাঠালি খুড়িয়া, পান (জাতি পান, আসামী পান, বড় পান) ইত্যাদি।

শাক সবজি ঃ

ওল কপি, কচু, মান কচু, শোলা কচু, সজি কচু, দুধ কচু, বিষ কচু, কাবরি কচু, কাঁচা কলা, থোড়, বাড়ালি, কইল্লা (করলা), কুমড়ো (মাটিয়া, জাঙ্গি), গিমা, বতুয়া, লাউ, শিম, পালং, লাফা, পুঁই, পেঁপে, ঢেড়স, ঝিঙ্গা, বরবটি, চিচিংগা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বাদামী আলু, দম আলু, বেগুন, গেছো আলু, মাটিয়া আলু, পটল, চাল কুমড়ো, মূলো, কলমি, হেলেঞ্চা ঢেঁকিয়া শাক, লাল শাক, পাট শাক, ডাটা, তিতারি শাক, মটর শাক, খেসারি শাক, ধনেপাতা, বীট, গাজর, টমেটো, সজনে, কুয়াশ ইত্যাদি।

ডাল ঃ

খেসারি, মাস কলাই (ঠাকুর কলাই), টাউরি কলাই (রাহার কলাই) মটর, মুসুর, মুগ ইত্যাদি।

তৈলবীজ ঃ

তিল, তিসি, বাদাম, সরষে, সূর্যমুখী, ভেরেণ্ডা, মগা ইত্যাদি।

সূক্ষ্ম তন্তু ঃ

পাট (তিতা, তোসা), মেসতা পাট, তুলা (শিমুল, কার্পাস), রেশম (গুটি পোকা) ইত্যাদি।

খাদ্য শস্য ঃ

বিভিন্ন প্রকার ধান, গম, কাওন, চিনা, ভুট্টা, বজরা, মারুয়া, মাকাই ইত্যাদি।

ঘাস ঃ

হোগলা, ঘাগড়া, পুণ্ডি, মধুয়া, দূর্বা, চেপটি, কাশিয়া, এলুয়া, ছন, বিন্না, বাক্সা ঘাস, বাঁদালি ইত্যাদি।

মসলা ঃ

আদা, ধনিয়া, মৌরি, তেজ পাতা, পিয়াজ, রসুন, লঙ্কা, গুলমরিচ, হলুদ, দারচিনি ইত্যাদি।

গুড় ঃ

আখ, খেজুড় ইত্যাদি।

মাদক দ্রব্য ঃ

বংকেট, তামাক, হুকো, ছিলিম, খৈনী, তাড়ি, হাড়িয়া, চুলাই ইত্যাদি।

বাগান ঃ

কলা বাগান, সুপারি বাগান, পান বরোজ, লেবু বাগান, চা-বাগান, কমলা বাগান ইত্যাদি।

মাছ ঃ

আইড়, কই, শিঙ্গি, মাগুর, পুঁটি, শোল, সাটি, কাট্‌না, টেপা, দারিকা, ট্যাংরা, বোয়াল, বাইম, নদীচাঁদা, সরপুটি, বাঘি, চেলি, খলিয়া, কুরসা, কালবোস, শাল, ফলি, ভেদা, বালি ছেকা,

চাটা, বালিয়া, শিলটোকা, বৈরালি বা বোরেলি, চ্যাং, কুচিয়া, আহেলা, পানি মাছ (কচ্ছপ), শামুক, খসলা, গুত্তুম বা পয়া, গচি, ইচা বা ইচ্‌লা, মৌডকা, রাইচ্যাং, ভাগ্না মাছ, রানি, বাচা, চ্যাপটি, নদীয়ারি, মহাশোল, উথাব, তেলাপিয়া, খোট্টি, বাঁশপাতা, ভোলা, এলাং, চেলা, ঢাকরা, রুই, চিতল, শাল বা গজীড়, বাগ আইড়, তিতা, ল্যাংসা, খুটা বাতাসি, মুগরুম, ঘোরা, পগোল, খকসা, উটা (কাকল্যা), ঠোনা, দুরামাছ ইত্যাদি।

পাখি ঃ

শাড়ো (শালিক), গুই শালিক, ঘুঘু, মাছরাঙা, সাদাবক, কালা বক, দোয়েল, ঘেচু (ফিঙে), চড়ুই, বাবুই, কাক, চিল, পেঁচা, পানিকৌড়ী, ডাহুক, কোকিল, বালিহাঁস, হাঁস, মুরগি, কাঠঠোকরা, পায়রা, বাদুড়, হরিয়াল, ময়না, টিয়া, হাড়গিলা, মধুচোষা, বিন্দিচোরা, করুয়া, ভ্যালোয়া (শঙ্খচিল), ফুটিকজল (চাতক), বাওই, কলানাথ, বেসকঝেকি, টুনটুনি, হলদেপিয়ালি, ময়ূর, নীলকণ্ঠ, নদিয়া শাড়ো, মাছরাঙা, ধনেশ ইত্যাদি।

পশু ও জন্তু ঃ

কুকুর, গরু, ছাগল, খরগোস, ভ্যাড়া, ঘোড়া, বানর, বেড়াল, শুকর, হাতি, খাটাস, ভাল্লুক, হায়েনা, বেজি, বাঘ, ইদুর, চিতা বাঘ, উদ্, কাঠ বিড়াল, ভাম, খেকশিয়াল, শিয়াল, গণ্ডার, বাইসন, হরিণ, সজারু, মহিষ, বুনোমহিষ ইত্যাদি।

সাপ ঃ

গোমা (গোখরে), ডারাস, ঢোঁরা, গুঁইসাপ, লাউডগা, বাঁশ সাপ, শঙ্খনাগ, গেন্টি, সুতা সাপ, দুমুখা সাপ, গাঙ্গা সাপ ইত্যাদি।

কীটপতঙ্গ ঃ

উই, ফড়িং, পিঁপড়ে (লাল, কালো), রক্ত চোষা, টিকটিকি, আরশোলা, কাঁকড়া, কাঁকড়বিছা, গান্ধিপোকা, শ্যামাপোকা, বোল্লা (বোলতা), ঘাসফড়িং, জোঁক, জোনাকি, ঝিঁঝি পোকা, মাকড়সা, মশা, মাছি, মধুমাছি, ব্যাঙ (সোনা ব্যাঙ, কোলা ব্যাঙ, কোটরি ব্যাঙ, গেছো ব্যাঙ) ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক পরিচয় ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামো মূলতঃ কৃষির উপর নির্ভর করে। আলোচ্য অঞ্চলে অধিকাংশ মানুষের কৃষির প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। এখানকার হাটবাজার মূলতঃ কৃষিদ্রব্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তাই একটি বাজারে বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যের নাম নিয়ে বিভিন্ন 'হাটি' গড়ে ওঠে। যেমন — পাট হাটি, ধান হাটি, তামাক হাটি, সবজি হাটি, কলা হাটি, পান হাটি, চিড়া হাটি, দই হাটি, দুধ হাটি ইত্যাদি। তবে সব সময় যে চাষাবাদ লাভজনক হয় তা কিন্তু নয়। খরা বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে চাষে অনেক সময় ক্ষতিই বেশি হয়। তবু মানুষ চাষাবাদ করেন। এর পেছনে প্রচলিত একটি প্রবাদ বিরাট ভূমিকা পালন করে —

"ধান পান গাই
এই তিন হলে কারো দুয়ারে না যাই।"

এইরূপ ধারণার ফলেই হয়তো মানুষ কৃষিকাজ করেন। তাছাড়া কিনে খাওয়ার মতো সামর্থ সবার নেই। লাভজনক না হলেও ঘরের ফসলে সারা বৎসর খেতে পেলে মানুষ নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করে। আজকাল অবশ্য অনেকে ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত রয়েছে, যেমন — গ্যারেজ মিস্ত্রি, কাঠ মিস্ত্রি, রাজ মিস্ত্রি, ভ্যানচালক, রিক্‌সা চালক, মোটর গাড়ি চালক ইত্যাদি। এছাড়া বর্তমানে একটা বড় অংশ ভিন রাজ্যে কাজ করে এলাকায় অর্থনৈতিক অবস্থাকে সচল রেখেছে।

কৃষির মধ্যে ধান, পাট, তামাক, বিরাট ভূমিকা পালন করে। মূলতঃ এই তিনটি ফসলই অর্থনৈতিক কাঠামোর মূলে রয়েছে। আজকাল আলুও একটি অর্থকরী ফসল হিসেবে উঠে এসেছে। আমাদের রাজ্যে তেইশ লক্ষ বিঘা জমিতে আলু চাষ হয়। রাজ্যে আলুর গড় বিঘা প্রতি ৮৭ মন। সর্ব ভারতীয় গড় বিঘা প্রতি ৫৮ মন। পশ্চিমবঙ্গে সারা ভারতের প্রায় ৩৫ শতাংশ আলু উৎপাদন হয়। হুগলী, বর্ধমান, মেদেনীপুরে রাজ্যের উৎপাদনের ৬৫ শতাংশ আলু হয়। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায় ৩ লক্ষ বিঘা জমিতে আলু চাষ হয়। গড় ফলন জাতীয় গড় ফলনের প্রায় সমান।[২৭] ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, শীতলখুচী, সিতাই, দিনহাটা, তুফানগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার,ফালাকাটা ব্লকে ধান, তামাক, পাট, আলুই জীবিকার প্রধান হাতিয়ার। তিস্তা ও তোর্ষা নদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে তামাক উৎপাদন হত। একদা এই তামাক রপ্তানি হত ব্রহ্মদেশে (মায়ানমার), এছাড়া স্থানীয় পাইকাররা বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলেও এই তামাক রপ্তানি করত।

তামাকের মত পানও একটি অর্থকরী ফসল। ময়নাগুড়ি ব্লকের পানবাড়ি, ধওলাগুড়ি,

ধূপগুড়ি ব্লকের দুরামারি, মাগুরমারি, তুফানগঞ্জের বলরামপুর, বারকোদালি, আলিপুরদুয়ার, সলসলাবাড়ি, ভাটিবাড়ি, মরিচবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পান চাষ হয়ে থাকে। এই পান বিশেষ করে সুপারি বাগানে পরিলক্ষিত হয়। সুপারি গাছকে ঘিরে পান চাষ এতদঞ্চলের একটি বিশেষ রীতি। পান প্রধানতঃ দুই প্রকারের। ১. আসামী পান, এই পান একটু ঝাল হয়। ২. জাতি পান, এই পান মিষ্টি হয়। আর্থিক ও সামাজিক ভাবে রাজবংশী সমাজে পান-সুপারির ভূমিকা বিরাট। অতিথি অভ্যর্থনা থেকে শুরু করে বিদায় পর্যন্ত বিশেষ সম্মান হিসেবে পান-সুপারি অপরিহার্য। আজও তিস্তা ও তোর্ষা পারের একটি বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে বড় বড় পান-সুপারি বাগান লক্ষ্য করা যায়।

আলোচ্য অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ধান জন্মে। ধান বৎসরে দুইবার মাত্র রোপণ করা হয়। তার মধ্যে আউশ এবং আমনই প্রধান। বর্তমানে উৎপাদিত, লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় ধান সমূহের নাম, ধানের আকারগত বৈশিষ্ট্য এবং ভূ-প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হল।

জমির অবস্থা	ধানের জাত	গাছের উচ্চতা	দানার আকার	স্থিতিকাল
মাঝারি, উঁচু	কাতার	আংশিক বেঁটে	মাঝারি সরু	৯০-১০০
মাঝারি, উঁচু	ধারেয়া	আংশিক বেঁটে	মাঝারি সরু	৯০-১০০
মাঝারি, উঁচু	মালা	আংশিক বেঁটে	বেঁটে মোটা	৯০-১০০
নীচুজমি	গারো ঢেপি	আংশিক বেঁটে	মোটা	৯০-১০০
মাঝারি, নীচু	পাইজাম	বেঁটে	ছোট, মাঝারি সরু	৯০-১০০
মাঝারি, নীচু	আসামী (পাইজাম)	বেঁটে	ছোট, মাঝারি সরু	৯০-১০০
নীচু	বগাধান	আংশিক বেঁটে	মাঝারি সরু	৯৫-১১০
নীচু	বাইগন বিচি	আংশিক বেঁটে	সরু বেঁটে	৯৫-১১০
নীচু	ডুমুরা	আংশিক বেঁটে	সরু বেঁটে	৯৫-১১০
নীচু	পরাঙ্গী	আংশিক বেঁটে	মাঝারি বেঁটে	৯৫-১১০
নীচু	কাশিয়াবান্ধা	মাঝারি লম্বা	মাঝারি সরু	৯৫-১১০
নীচু মাঝারি	চায়না	আংশিক বেঁটে	মাঝারি সরু	১১০-১২০
নীচু মাঝারি	এরিধান	আংশিক বেঁটে	ছোট সরু	১১০-১২০
নীচু মাঝারি	দুধকলম	আংশিক লম্বা	মাঝারি লম্বা	১৪০-১৬০
নীচু, মাঝারি	কলম	আংশিক লম্বা	মাঝারি লম্বা	১৪০-১৬০
নীচু মাঝারি	স্বর্ণ	আংশিক বেঁটে	মাঝারি বেঁটে	১৪০-১৪৫

জমির অবস্থা	ধানের জাত	গাছের উচ্চতা	দানার আকার	স্থিতিকাল
নীচু মাঝারি	জাদু	আংশিক লম্বা	মাঝারি বেঁটে	১৩০-১৪৫
উঁচু ও মাঝারি	ভোগধান	আংশিক লম্বা	সরু	১৩০-১৪৫
উঁচু ও মাঝারি	নুনিয়া	আংশিক লম্বা	সরু	১৩০-১৪৫
উঁচু ও মাঝারি	নুনিয়া (কালো)	আংশিক লম্বা	সরু	১৩০-১৪৫
নীচু মাঝারি	বন্নিধান	আংশিক লম্বা	মাঝারি বেঁটে	১২০-১৪০
নীচু মাঝারি	কুকুর জালি	আংশিক লম্বা	মাঝারি সরু	১৩০-১৪০
নীচু মাঝারি	লাল ঢেপি	আংশিক লম্বা	বেঁটে মোটা	১৩০-১৪০
নীচু মাঝারি	লোহা জাং	আংশিক লম্বা	বেঁটে মোটা	১৩০-১৪০
সর্বত্র	বচি	আংশিক লম্বা	বেঁটে মোটা	১৩০-১৪০
সর্বত্র	আইরেট	আংশিক লম্বা	বেঁটে মোটা	১৩০-১৪০
সর্বত্র	লালসীতা	আংশিক লম্বা	সরু লম্বা	১৩০-১৪০
সর্বত্র	সাম্বা মাসুরি	আংশিক লম্বা	সরু লম্বা	১৩০-১৩৫
সর্বত্র	নিলাঞ্জনা	আংশিক লম্বা	সরু লম্বা	১৪০-১৪৫
মাঝারি	স্বর্ণমাসুরি	মাঝারি লম্বা	ছোটো সরু	১২০-১৩০
মাঝারি	মাশুরি	মাঝারি লম্বা	সরু, স্বর্ণ বর্ণ	১২০-১৩০
মাঝারি	রাজলক্ষ্মী	মাঝারি লম্বা	সরু, স্বর্ণ বর্ণ	১৪০-১৪৫
মাঝারি	হীরা	মাঝারি লম্বা	সরু, স্বর্ণ বর্ণ	১৪০-১৪৫
মাঝারি	শ্যামলী	মাঝারি লম্বা	সরু, স্বর্ণ বর্ণ	১৪৫-১৫০
মাঝারি, নীচু	রঞ্জিত	আংশিক লম্বা	লম্বা, সরু	১৪০-১৫৫
মাঝারি, নীচু	পঙ্কজ	আংশিক লম্বা	লম্বা, সরু	১৪৫-১৫০
মাঝারি, নীচু	সি. আর. ১০০৬	আংশিক লম্বা	লম্বা, সরু	১৫০-১৫৫
মাঝারি, নীচু	সি. আর. ১০১০	আংশিক লম্বা	লম্বা, সরু	১৫৫-১৬০
মাঝারি, নীচু	উৎকল প্রভা	আংশিক লম্বা	লম্বা, সরু	১৫৫-১৬০
সর্বত্র	ধরিত্রী (সি. আর. ১০১৭)	মাঝারি লম্বা	বেঁটে, সরু	১৫৫-১৬০
সর্বত্র	গায়ত্রী - সি. আর. ১০১৮	মাঝারি লম্বা	বেঁটে, সরু	১৫৫-১৬০

জমির অবস্থা	ধানের জাত	গাছের উচ্চতা	দানার আকার	স্থিতিকাল
সর্বত্র	আই. আর. - ২৬	আংশিক বেঁটে	বেঁটে, সরু	১৫৫-১৬০
সর্বত্র	আই. ই. টি. - ৫৬৫৬	আংশিক বেঁটে	বেঁটে, সরু	১৫৫-১৬০
সর্বত্র	বি.এন. ২০	আংশিক বেঁটে	বেঁটে, সরু	১৫৫-১৬০
সর্বত্র	এন.সি. কলমা	আংশিক লম্বা	মাঝারি লম্বা	১৫৫-১৬০
সর্বত্র	সাবিত্রী (সি.আর. ১০০৯)	আংশিক লম্বা	মাঝারি লম্বা	১৫৫-১৬০
বেশি নীচু জমি	সবিতা (এন.সি. ৪৯২)	মাঝারি লম্বা	মাঝারি, সরু	১৫৫-১৬০
বেশি নীচু জমি	লুনিশ্রী সি.আর.এম. ৩০	মাঝারি লম্বা	মাঝারি সরু	১৬০-১৬৫
বেশি নীচু জমি	গীতাঞ্জলি	মাঝারি লম্বা	মাঝারি সরু	১৬০-১৬৫
সর্বত্র	জয়া	আংশিক বেঁটে	মোটা, সাদা	১৪৫-১৫৫
সর্বত্র	ইরি-আট	আংশিক বেঁটে	মোটা, লম্বা	১৪৫-১৫৫
উচু ও মাঝারি	সাদা নুনিয়া	মাঝারি লম্বা	সাদা, সরু	১৬০-১৬৫
মাঝারি নীচু জমি	সরু স্বর্ণ (এম.টি.ইউ.৭০২৯)	আংশিক বেঁটে	মাঝারি সরু	১৪০-১৪৫
উঁচু জমি	অন্নদা (আই.ই.টি.- ৬২২৩)	আংশিক বেঁটে	বেঁটে মোটা	১০৫-১১০
উঁচু জমি	আদিত্য (আই.ই.টি.- ৭৬১৩)	মাঝারি লম্বা	লম্বা মোটা	৯৫-১০০
উঁচু জমি	রসি (আই.ই.টি.- ১৪৪৪)	বেঁটে	মাঝারি মোটা	১০৫-১১০
উঁচু জমি	পারিজাত (আই.ই.টি.- ২৬৮৫)	আংশিক বেঁটে	সরুদানা	৯৫-১০০
উঁচু জমি	ভূপেন (আই.ই.টি.- ১২১৩২)	মাঝারি লম্বা	লম্বা সরু	১১০-১১৫
মাঝারি জমি	শতাব্দী (আই.ই.টি.- ৪৭৮৬)	আংশিক বেঁটে	খুব সরুলম্বা	১১০-১১৫

জমির অবস্থা	ধানের জাত	গাছের উচ্চতা	দানার আকার	স্থিতিকাল
মাঝারি জমি	ক্ষিতীশ (আই.ই.টি.- ৪০৯৪)	বেঁটে	লম্বা সরু	১১৫-১২০
মাঝারি জমি	ললাট (আই.ই.টি.- ৯৯৪৭)	আংশিক বেঁটে	লম্বা সরু	১১৫-১২০
মাঝারি জমি	আই. আর. ৩৬ (আই.ই.টি.- ৪৫৫৫)	আংশিক বেঁটে	লম্বা সরু	১১৫-১২০
মাঝারি জমি	গজপতি (আই.ই.টি.- ১৩২৫১)	আংশিক বেঁটে	মাঝারি মোটা	১১৫-১২০
মাঝারি জমি	সুরক্ষা (আই.ই.টি.- ৭৯৪৬)	আংশিক বেঁটে	লম্বা মোটা	১১৫-১২০
মাঝারি নীচু	বিজেতা (এম.টি.ইউ.- ১০০১)	আংশিক বেঁটে	মাঝারি লম্বা মোটা	১৩৫-১৪০
মাঝারি নীচু	অজয়া (আই.ই.টি.- ৮৫৮৫)	আংশিক বেঁটে	লম্বা মোটা	১৩০-১৩৫
নীচু জমি	শশী	মাঝারি লম্বা	লম্বা সরু	১৪৫-১৫০
নীচু জমি	সি.আর.-১০১৪	মাঝারি লম্বা	মাঝারি সরু	১৫০-১৬০
নীচু জমি	সি.আর.-১০০২	আংশিক বেঁটে	বেঁটে মোটা	১৫০—১৬০
বেশি নীচু জমি	অমূল্য	লম্বা	লম্বা সরু	১৫৫-১৬০
বেশি নীচু জমি	ভূদেব	মাঝারি লম্বা	মাঝারি সরু	১৫০-১৬০
বেশ নীচু জমি	আই.ই.টি. - ১৪৪৯৬	মাঝারি লম্বা	মাঝারি সরু	১৫০-১৬০
মাঝারি জমি	বুড়াবন্নী	মাঝারি লম্বা	লম্বা, সরু	১৫০-১৬০
উঁচু জমি	বোয়াপাকড়ি	আংশিক বেঁটে	বেঁটে, সরু	১৫০-১৬০
উঁচু, মাঝারি	বামনভোগ	আংশিক বেঁটে	বেঁটে, সরু	১৪০-১৫০
উঁচু, মাঝারি	ধাউলি	আংশিক লম্বা	মাঝারি, সরু	১৪০-১৫০
সর্বত্র	পাখিরি	মাঝারি লম্বা	লম্বা, সরু	১৪০-১৪৫
সর্বত্র	ফুল পাখিরি	মাঝারি লম্বা	লম্বা, সরু	১৪০-১৪৫
উঁচু, মাঝারি	কাঁতসাইল	আংশিক লম্বা	লম্বা, বেঁটে	১২০-১৩০

জমির অবস্থা	ধানের জাত	গাছের উচ্চতা	দানার আকার	স্থিতিকাল
নীচু জমি	বড়োপানাতি	আংশিক লম্বা	লাল, লম্বা	১৫০-১৬০
নীচু জমি	ছোটপানাতি	আংশিক লম্বা	লাল, ছোটো	১৫০-১৬০
নীচু জমি	আমলাকাসা	আংশিক লম্বা	মোটা, লম্বা	১৫০-১৬০
নীচু জমি	গাঠিয়া	লম্বা মোটা	মোটা, বেঁটে	১৫০-১৬০
উর্বর মাঝারি	নীলাজি	আংশিক বেঁটে	লম্বা, সরু	১৪০-১৪৫
উঁচু, মাঝারি	বীরমন্দিনী	মাঝারি লম্বা	কালোলালচে, লম্বা	১৩০-১৪০
উঁচু, মাঝারি	জমিরা	মাঝারি লম্বা	মোটা, খয়েরি	১৪০-১৫০
উঁচু, মাঝারি	গোবিন্দ ভোগ	আংশিক বেঁটে	ছোটো, সরু	১৬০-১৬৫
নীচু জমি	বাতাই ধান	লম্বা	মোটা, লম্বা	১৭০-১৮০
নীচু জমি	হরিণতুর (মুড়ির জন্য বিখ্যাত)	মাঝারি লম্বা	মাঝারি, মোটা	১৫০-১৬০
মাঝারি জমি	স্বপনডেলি	মাঝারি লম্বা	লম্বা, সরু	১৫০-১৬০

এছাড়া আরো কিছু ধানের নাম পাওয়া যায় যেমন — বলরামভোগ, চিনিশংকর, ইন্দ্রসাইন, বগাঝুন, মহারাজা, ভূসর, যোশোয়া, গুঞ্জারী, খাঙ্গারমাও, হলদিজাম, নারিকেলঝোপা, চাপান, ভুমরা, কালপুখরি, ছাইতান, সাটিয়া, উবজাল, কালো শনি, মেঘ আন্‌ধারি, বারিবাংলা, ছোট শনি, ধলকাচ্চা, বোয়াদার, লুধিয়ান, মালশিরা ভাদই, ধৌলি, কচুডালা, রাভণ, এ্যাণ্ডা, কাকুয়া, এন্দুরশাইল, পানিশাইল, কেওয়া, বিন্দিভোগ, গান্‌জিয়া, কাঠারিভোগ, নাইওর, বিন্নাফুলি, কলড়োমা, ডাঙ্গাবোরুয়া, পব্বতজিরা, উকনিমধু, গড়িয়া, নেলপাই, পাড়াসী, ছাতনডুম্‌রা, জগন্নাথভোগ প্রভৃতি।

গ) সমাজজীবন ও জনবিন্যাস ঃ

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত নানা জাতি ও উপজাতি, বর্ণ ও ধর্মের লোকেরা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলা অর্থাৎ তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে পদার্পণ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে স্থায়ীভাবে বাস করছে। কেউবা ইতিহাসের নিয়মে কিছুকাল এখানে অবস্থান করে অন্যত্র চলে গিয়েছে আবার কেউ কেউ মিশে গিয়েছে পরবর্তী মানব প্রবাহের সঙ্গে। কিন্তু এইসব মানবগোষ্ঠীর অবশেষগুলি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। এখানকার ভাষা, সংস্কৃতি ও জনগঠনের মধ্যে আশ্রয় লাভ করে গড়ে তুলেছে একটি মিশ্র জনমণ্ডলী। তিস্তা ও তোর্ষা পারে এই রূপ জনমণ্ডলীর মধ্যে কোচ, রাভা, টোটো, মেচ, সাঁওতাল, বোড়ো, ওরাওঁ অন্যতম।

আলোচ্য অঞ্চলের সমাজ মূলতঃ গ্রামীণ সমাজ। মহকুমা ও ব্লকভিত্তিক শহর থাকলেও সেই শহরগুলিতে যারা বাস করেন, তারা কোন না কোন ভাবে গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে যুক্ত। তবে চাকুরি ব্যবসা ইত্যাদি কারণে গ্রামীণ সমাজে পশ্চিমি সভ্যতা ও বাইরের শহুরে সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একত্রে বাস করেন। যে যার বৃত্তি করা ছাড়াও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক কারণে অন্যান্য বৃত্তিও করে থাকেন। সমাজে দেউনিয়া ব্যবস্থা আজও রয়েছে। তবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আসার পর 'দেউনিয়া' বা 'দেওয়ানির' গুরুত্ব অনেকটা কমে গেছে। কয়েক দশক পূর্বেও একান্নবর্তী পরিবারের চিত্র দেখা গেছে। আজ আর খুব একটা দেখা যায় না। বাল্য বিবাহ ও বিধবা বিবাহ খুব একটা দেখা না গেলেও গ্রাম্য দলাদলি ইত্যাদি পরিচয় পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক চিত্র ও সমাজ চিত্র পরস্পর পরিপূরক। তাই আর্থ-সামাজিক চিত্রের পর্যালোচনায় এবার আমরা উত্তরবঙ্গের সমাজচিত্র অবলোকন করব।[২৮] নিচের টেবিলের মাধ্যমে একটি শ্রেণিগত সমাজ চিত্রের নমুনা দেওয়া হল —

উচ্চবিত্ত	মধ্যবিত্ত	নিম্নবিত্ত	সাধারণ	অতি সাধারণ
জমিদার,	উকিল, ডাক্তার,	সাধারণ কৃষক,	প্রান্তিক কৃষক,	ভূমি ও গৃহহীন
জোতদার,	শিক্ষক, পুলিশ,	সাধারণ সরকারী	জেলে, কুলি	কৃষি ও অকৃষি
মহাজন,	চা-বাগানের বাবু,	চাকুরে, মুদি	মজুর, মাঝি,	শ্রমিক, ভিখারী
চাকলাদার,	ছোট ব্যবসায়ী,	দোকানদার	সাপুড়ে,	ইত্যাদি
চা-বাগানের	স্বাধীন বড় চাষী	ইত্যাদি	দোকানের	
মালিক,	ইত্যাদি		কর্মচারী,	
কন্ট্রাক্টর,			রিক্সাওয়ালা,	
বড় ব্যবসায়ী,			কৃষি শ্রমিক,	
বড় চাকুরে			সীমান্তের	
ইত্যাদি			চোরাকারবারী	
			ইত্যাদি	

শ্রেণি বা পেশাগত সমাজচিত্রের পর এবার আমরা ভাষা/উপভাষা, ধর্ম, সম্প্রদায় লিঙ্গ ও অন্যান্য বিষয়ের এতদঞ্চলের চিত্র পর্যালোচনা করব।

ভাষা/উপভাষা	ধর্ম	সম্প্রদায়	লিঙ্গ	অন্যান্য
রাজবংশী	হিন্দু,	রাজবংশী	পিতৃশাসিত,	উদ্বাস্তু
সাঁওতাল	মুসলমান	নমঃশূদ্র	মাতৃশাসিত	থারু
মদেশিয়া	খ্রীষ্টান	ধাওয়া	মহিলাদের	ধীমাল
নেপালি	বৌদ্ধ	মালো	অবস্থান।	মেচ, রাভা
বাঙ্গালী	ইত্যাদি।	কৈবর্ত		গারো,
কুরমী		ইত্যাদি।		টোটো
টোটো/ডুকপা				ইত্যাদি।
ইত্যাদি।				

আর্যদের আগমনের পূর্বে উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের সীমানা জুড়ে বাস করতেন প্রাক্-আর্যগোষ্ঠীর মানুষ কোল, ভীল, মুণ্ডা, পুলিন্দ, কিরাত ও শবরেরা। পরবর্তীকালে নেপাল ও হিমালয়ের দক্ষিণবঙ্গ, বিহার ও কামরূপ অঞ্চল বাস করতে এসেছেন হিমালয়-প্রান্তিক মঙ্গোল

শাখার মানুষ। এরাই প্রধানতঃ কিরাত গোষ্ঠীর মানুষ। একদিকে আর্য সংস্কৃতি ও অন্যদিকে কিরাত-সংস্কৃতির মিলনের ফলে সৃষ্ট উত্তরবাংলার সংস্কৃতি তাই স্বাভাবিক ভাবেই মিশ্র সংস্কৃতি। বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ই এই সংস্কৃতির প্রধান কথা। পরবর্তীকালে এখানে এসেছেন ইংরেজ, মোঘল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল প্রভৃতি শ্রেণির মানুষেরা। নেপালিরাও এসেছেন এখানে। ইতিহাস বলে, যুগে যুগে এখানে নানা ধর্মের প্লাবনও বয়ে গিয়েছে এখানে। হিন্দু, বৌদ্ধ, শৈব, জৈন, নাথ এবং খ্রীষ্ট্র ধর্মের ধারাও এসেছে এখানে অবিচ্ছিন্ন গতিতে। পাল আমলে এখানে যে বৌদ্ধ সংস্কৃতির জোয়ার জেগেছিল সে কথাও ইতিহাস সমর্থিত। মহাযান শাখার বৌদ্ধরা যারা তান্ত্রিক বৌদ্ধ বা সাধকরূপে পরিচিত উত্তরবঙ্গে নানা স্থানে তাদের নানা মূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে। নানা ধরনের আচার-আচরণ ধর্মবিধি এখানে ছড়িয়ে রয়েছে। পাল রাজাদের পর সেন রাজাদের যুগে আবার এসেছে হিন্দুধর্ম। অন্যদিকে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রবাহ পাশাপাশি বয়ে গিয়েছে। উত্তরবাংলার লোকসাহিত্য তাই এই বিচিত্র লোকসংস্কৃতির প্রেরণা। কামরূপ কামতা বা কুচবিহার রাজ্যের নানা ক্ষেত্রে এই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। সুতরাং বলা যেতে পারে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চল বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

উত্তরবঙ্গের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক। অবশ্য এর বাইরে আসামের গোয়ালপাড়া জেলা, কামরূপে উত্তরে নওগা জেলার পশ্চিমাংশেও রাজবংশীদের বাস আছে। এই রাজবংশী সমাজের উদ্ভব ও আবির্ভাব সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ইংরেজ গবেষকদের হান্টার[২৯] রিজলি[৩০] রাজবংশীদের দ্রাবিড়িয় শাখার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ও ডোলেন[৩১] তাঁর "ভারত আদম সুমারির বিবরণ" (১৮৯১) প্রসঙ্গে মনে করেছেন যে পূর্ব গিরিপথগুলি দিয়ে মঙ্গোলীয়দের আগমন ধারার তৃতীয় শাখা রাজবংশীগণ। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজবংশীদের মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর তিব্বত ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শাখার লোক বলেছেন।[৩২] ড. গিরিজাশঙ্কর রায় মনে করেন "আসাম, ব্রহ্মদেশ, ত্রিপুরা, নেপাল এবং হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত স্থানগুলির লোকেদের যে মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার দৈহিক আকৃতির বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়কে বিচার করিলে এই মতের সমর্থন না করিয়া পারা যায় না। পরবর্তীকালে ইহাদের সহিত অষ্ট্রিক দ্রাবিড় ভাষা-ভাষি গোষ্ঠীর মিশ্র জাতি বাঙ্গালীদের সহিত রক্ত সংমিশ্রণ ঘটিতে পারে। তাহার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রাজবংশীরা যে ভাষায় কথা বলিয়া থাকে, সেটি বাংলা ভাষারই একটি বিশিষ্ট উপভাষা।"[৩৩] আমরা অবগত আছি যে জনতত্ত্ব নিরূপণে ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতির ভূমিকা কিছু মাত্র কম নয়। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন — জননির্ণয়ে ভাষা বিশ্লেষণ যে অন্যতম সহায়ক

একথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কোন জনের ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া যদি দেখা যায় যে সেই ভাষায় জীবন চর্যার মূল শব্দগুলি কিংবা পদরচনা রীতি কিংবা পদভঙ্গি অথবা মানুষ ও স্থান ইত্যাদির নাম অন্যকোন জনের ভাষা হইতে গৃহীত বা উদ্ভূত তখন স্বভাবতই এ অনুমান করা চলে যে সেই পূর্বোক্ত জনের সঙ্গে শেষোক্ত জনের রক্তে সংমিশ্রণ না হোক মেলা মেশা ঘটিয়াছে।"[৩৪] খ্রীষ্ট্র-পূর্ব চতুর্থ শতকে আর্য ভাষীরা এবং তার কিছুকাল পরে তিব্বত ব্রহ্মীয় ভাষীরা যদি বাংলাদেশে প্রবেশ করে থাকে অনুমান করা যেতে পারে তা হলে এটাও অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে বাংলাদেশে আর্যভাষী বনাম প্রাগার্যভাষীদের সভ্যতা সংস্কৃতির সংঘাত সমন্বয় গ্রহণ বর্জন যখন চলছিল তখন তাতে আর্যপর তিব্বত-ব্রহ্মীয় ভাষা-শাখার লোকদেরও একটা সবিশেষ ভূমিকা বর্তমান ছিল।[৩৫] সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন খ্রীষ্টাব্দ গণনার সময়েই আসাম, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে তিব্বত ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শাখার বৃহৎ বোড়ো জাতির মেচ কোচ কাছারি প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি বসতি স্থাপন করে।[৩৬] আর্য ও প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ভাষার মিলনে এতদঞ্চলের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিপুলভাবে পরিপুষ্ট হয়। ইন্দো-মঙ্গোলীয়রাই এ অঞ্চলের প্রধান জনগোষ্ঠী সুতরাং আর্য ভাষার মিলনের ফলে এখানে ভাষার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য দেখা যায়। দশম শতাব্দীতে প্রাপ্ত উত্তরবাংলার একটি শিলালিপিতে বেশ কিছু তিব্বত ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় শব্দ দেখা যায়।[৩৭] এগুলি প্রধানতঃ স্থানে নাম এবং স্থান বিশেষের বিবরণ বাচক শব্দ। যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদে আলোচনা করা যাবে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশ্রণের ফলে দৈহিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু রাজবংশীরা আদিতে মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত।

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা তথা উত্তরবঙ্গের সমাজ জীবনের স্রোতধারায় যারা এসেছেন, তার মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা না বললেই নয়। সমাজ বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এতদঞ্চলে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এই সূত্রে নস্যশেখ জনগোষ্ঠীর বসবাস উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলাতে বেশ পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণের মতে নস্যশেখ মুসলিমদের উৎস রাজবংশী, কোচ ও পলিয়া। শুধু ধর্ম বিশ্বাস ছাড়া অন্যত্র এমন পার্থক্য নেই। J.F. Grunning ১৯১১ সালের রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন — 'The sheikhs and the Nashyas may be considered native to the district (Jalpaiguri), though a considerable number of them came originally from the adjoining districts of Rangpur and Dinajpur and from the Cooch Behar state. In appearence, dress and customs, they differ little from the Rajbansis.'[৩৮] এইসূত্রে তাই বলা যায় নস্যরা এখানকার ভূমিপুত্রও বটে। এখানকার স্থানীয় জনগোষ্ঠী কোচ-রাজবংশীদের সমস্ত চিহ্নই

তাদের মধ্যে বিদ্যমান। Grunning সাহেবও উল্লেখ করেছেন - 'They were very much the sons of the soil.'[৩৯]

এবার দেখা যাক তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অর্থাৎ জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার জনবিন্যাস (২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী)।

মোট জনসংখ্যা :	৬৮৮০৩২৮ জন
পুরুষ :	৩০২৩২৩৯ জন
মহিলা :	৩৮৫৭০৮৯ জন
সাধারণ :	২৭৩৩৪৪৩ জন
পুরুষ :	১৪১২২৯০ জন
মহিলা :	১৩২১১৫৩ জন
তপশিলি জাতি :	২৪৯০৯৫১ জন
পুরুষ :	১২৭৯২৭৪ জন
মহিলা :	১২১১৬৭৭ জন
আদিবাসী :	৬৫৫৯৩৪ জন
পুরুষ :	৩৩১৬৭৫ জন
মহিলা :	৩২৪২৫৯ জন

কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত জনবিন্যাস (২০০১) —

কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত -

মোট জনসংখ্যা :	১৬৩১২৪৫ জন
সাধারণ :	৬০৩০৪৮ জন
তপশিলি :	৯২৬৭৮৯ জন
আদিবাসী :	১০১৪০৮ জন

কৃষি শ্রমিকের জনবিন্যাস —

মোট শ্রমিক :	১৩৩৩৩৫৮ জন
সাধারণ :	৫০৩৯৬৭ জন
তপশিলি :	৭৪৬৬২৭ জন
আদিবাসী :	৮২৭৬৪ জন

পশ্চিমবঙ্গে রাজবংশী সমাজের জনবিন্যাস (১৯৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী) ঃ

প্রশাসনিক বিভাগ	মোট রাজবংশী	শতকরা
জলপাইগুড়ি বিভাগ	১০,২৭,৬৬৯ জন	৭৫.৯০
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	২,২৬,২৫০ জন	১৬.৭২
বর্ধমান বিভাগ	১,০০,০০০ জন	৭.৩৮

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের জনবিন্যাস (১৯৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী) ঃ

জেলা	মোট রাজবংশী	শতকরা
কুচবিহার	৪,৮১,৩০৪ জন	৪৬.৮৪
জলপাইগুড়ি	৩,২৯,১৯১ জন	৩২.০৩
দার্জিলিং	৩১,৫০৫ জন	৩.০৬
পশ্চিম দিনাজপুর	১,৩৪,৯৭৬ জন	১৩.১৩
মালদহ	৫০,৬৯৩ জন	৪.৯৪

এখন দেখা যাক পশ্চিমবঙ্গে ২০০১ সালের আদমসুমারি অনুসারে রাজবংশী সমাজের জনবিন্যাস কিরূপ ঃ

প্রশাসনিক বিভাগ	মোট রাজবংশী	শতকরা
জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮,১৮,৬৪৭ জন	১৯.১৪
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	৩২,৩৯,৯৯২ জন	১.১০
বর্ধমান বিভাগ	৩৭,৪৭,৯৫ জন	১.০৩

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের জনবিন্যাস (২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী) ঃ

জেলা	মোট রাজবংশী	শতকরা
কুচবিহার	৯,৭২,৯২৮ জন	৩৯.২৪
জলপাইগুড়ি	৮,১১,৬২৭ জন	২৩.৮৬
দার্জিলিং	১,২৯,৯৭৯ জন	৮.০৭
দক্ষিণ দিনাজপুর	২,৯৪,৩৫৭ জন	১৯.৫৮
উত্তর দিনাজপুর	৪,৩৭,৯৬২ জন	১৭.৯৩
মালদহ	১,৭১,৭৯৪ জন	৫.২২

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের মোট রাজবংশী জনসংখ্যা (১৯৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী) যেখানে ৮,১০,৪৯৫ জন, সেখানে ২০০১ সালে আদমসুমারি অনুসারে মোট জনসংখ্যা দাড়িয়েছে ১৭,৮৪,৫৫৫ জন। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ২২০ শতাংশ।

এবার আলোচনা করে দেখা যাক আমাদের প্রকল্পধৃত রাজবংশী সমাজের উৎপত্তি কথা। রাজবংশী বলে যে জনজাতি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নেপাল, উত্তরপূর্ব ভারত, ভূটান ও বাংলাদেশে বাস করে তাদের পরিচয় কি? নেপালি? ভূটানি? আবার বাংলাদেশে কেউ কেউ এদেরকে আদিবাসী বলে। ভারতীয় সংবিধানের ভিতর থেকে এক এক রাজ্যে এক এক রকম সংরক্ষণের আওতায় পড়েছে। অসমের রাজবংশীরা MOBC[৪০] (More other Backward Class), বিহারে OBC পশ্চিমবঙ্গে SC আবার অসমে এক বছরের জন্য হয়েছিল ST, ইংরেজ গবেষকদের ভুল গবেষণার তথ্য দিয়ে এখনও কেউ কেউ এদেরকে বলতে চায় আর্যগোষ্ঠী, দ্রাবিড়গোষ্ঠী, Proto-Australoid ইত্যাদি। কিন্তু অনেক নৃ-তত্ত্ববিদ ও জাতিতত্ত্ববিদ (Ethnologist) রাজবংশী সমাজটাকে Indo-Mongoloid গোষ্ঠীর একটি শাখা বলে মনে করেছেন। অবশ্য আজকাল সমুদায় সমাজটাকে কোচ-রাজবংশী সমাজ বলে চিহ্নিত করা হয়। আর এই সূত্র ধরে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজবংশী সমাজে উৎসকথা বিচার করলে দেখা যায় রাজবংশী সমাজের আসল গোত্র পরিচয়ের উদ্ভব কথা।

জানা যায় চর্যাপদ লেখা হয়েছিল হিমালয় পর্বতের কোলে বসে। আর সেখানেই অন্যান্য ভাষার সঙ্গে রাজবংশী ভাষারও কিছু কিছু সূত্র পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও তন্ত্রবৌদ্ধকালে রাজবংশী সমাজও বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তার প্রমাণ তন্ত্রবৌদ্ধের নানা আচার অনুষ্ঠান এখনও এই সমাজে দেখা যায়। আবার জৈন ধর্মের প্রভাবের কথাও পণ্ডিতেরা কেউ কেউ বলে গেছেন। প্রায় পাঁচশত বছর পূর্বে চৈতন্য পন্থী বৈষ্ণবধর্ম পশ্চিমবঙ্গে আর অসমে শংকরীয় বৈষ্ণবধর্ম দেখা দিলেও চৈতন্যধর্মী বৈষ্ণবধর্ম রাজবংশী সমাজে দেখা যায় খুব হলে দু'শ বছর আগে। কিন্তু কোচ রাজা নরনারায়ণের কাল থেকে শঙ্করীয় বৈষ্ণব ধর্ম কিছুটা গ্রহণ করেছে। যা রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মাও বলে গেছেন।[৪১]

পণ্ডিতদের কথামতো যদি কামরূপ রাজা ভাস্কর বর্মার সময় থেকে কল্কিকরণ (Sanskritization) ধরে নিই তাহলেও ক্ষত্রিয় আন্দোলন রাজবংশী সমাজের জাতিসত্তা বা জনগোষ্ঠী নিয়ে উৎস সন্ধানে খুবই নাকাল হতে হয়। কেননা, কালে কালে রাজবংশী ও কোচরাজবংশী সমাজে মিশে যায় আরো নানা প্রজাতির মঙ্গোলিয়ান - অমঙ্গোলিয়ান জনজাতি। যার পরিচয় আজও উজ্জ্বল হয়ে দেখা যায়। এই সব জনজাতির ভিতরই লুকিয়ে আছে রাজবংশী

জনগোষ্ঠী ও জাতিসত্তা।

রাজবংশী সমাজে আর্যসংস্কৃতির মতো নানা বর্ণবিভাজন ছিল না। কিন্তু আর্যীকরণের ফলে গোত্র হারিয়ে সমাজটা অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। আর বৈষ্ণব সংস্কৃতির দ্বারা যখন প্রভাবিত হয় তখন সমাজে উদ্ভব ঘটে 'অধিকারী' পদবীধারী সমাজ। অসমে 'মেধী', 'ভকত' পদবীধারী সমাজ। কেউ কেউ পূর্বের পদবী ভুলে বৈষ্ণব ধারার পদবীই গ্রহণ করে। তার সঙ্গে চলতে থাকে শঙ্করীয় সংস্কৃতির প্রভাব যা 'শরণীয়াকরণ' নামে পরিচিত। কোচ রাজা বিশ্বসিংহের উত্তরকালে 'শরণীয়াকরণ' নিম্ন অসমের রাজবংশী সমাজকে খুব করে নাড়া দেয়। আর অন্যদিকে, অবিভক্ত গোয়ালপাড়ার খানিক অংশ উত্তরবঙ্গ, নেপাল, বিহার আর রংপুরে নাড়া দেয় ক্ষত্রিয়করণ আন্দোলন। ড. স্বরাজ বসু বলেছেন — "to claim a kshatriya descent was an out come of Brahminical cultural domination, British lower caste policies and the social changes brought about by the colonial rule."[৪২]

অঞ্চলভেদে রাজবংশী পরিচয় ঃ

ভূগোল আর ইতিহাসের তাপে ও চাপে রাজবংশী সমাজ বঙ্গ অসমিয়া, নেপালি এবং বিহারীকরণ হলেও সামাজিক ভাবে (Social sub-group) এই অংশের লোকেরা নিজের মত করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। অঞ্চলভেদে এই সমাজকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।[৪৩] যেমন —

১. ঝারুয়া রাজবংশী ঃ

ঝাড় অঞ্চলে বাস করে যে রাজবংশী সমাজ। কিন্তু এখন আর আগের মতন ঝাড় নেই, তাই ঝারুয়া রাজবংশী অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

২. ঘুলিয়া রাজবংশী ঃ

অসমের বিজনী রাজার ঘুলিয়া পরগণায় বাস করত এই রাজবংশী সমাজ।

৩. মরঙ্গীয়া সমাজ ঃ

পূর্ব নেপালের মরঙ্গ বা মরং পরগণা যা দার্জিলিং জেলার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ছিল। এতদঞ্চলে বসত করা রাজবংশী সমাজ মরঙ্গীয়া রাজবংশী সমাজ নামে পরিচিত। কোন কোন পণ্ডিত মরঙ্গীয়া সমাজকে একটি আলাদা নৃ-গোষ্ঠী বলে উল্লেখ করেছেন।

৪. রংপুরীয়া রাজবংশী ঃ

রংপুর অঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশী মানুষের পরিচয় রংপুরীয়া রাজবংশী নামে। একসময় জলপাইগুড়ি, কুচবিহার এবং অসমের অবিভক্ত গোয়ালপাড়া ছিল রংপুরের ভিতর।

৫. সূর্যাপুরীয়া রাজবংশী ঃ

বিহারের কিশানগঞ্জ এবং পশ্চিমবঙ্গের ইসলামপুর মহকুমা সূর্যাপুর পরগণা নামে পরিচিত ছিল। সেখানকার বসবাসকারী রাজবংশী সমাজকে সূর্যাপুরীয়া রাজবংশী বলে চিহ্নিত করা হয়।

৬. চরুয়া রাজবংশী ঃ

চর অঞ্চলে বাস করা রাজবংশী সমাজকে চরুয়া রাজবংশী বলা হয়। এখনও ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে একটি চরের নাম রাজবংশী চর। পশ্চিম অসমের সাপটগ্রাম অঞ্চলে কিছু মানুষ চর অঞ্চল থেকে এসেছে বলে তাদেরকে চরুয়া রাজবংশী বলে চিহ্নিত করা হয়।

৭. ডখরিয়া রাজবংশী ঃ

অসমের বঙ্গাইগাঁও জেলার ডখরা পরগণায় বসবাসকারী রাজবংশী সমাজকে ডখরিয়া রাজবংশী বলা হয়।

৮. বারো হাজারি রাজবংশী সমাজ ঃ

অসমের বঙ্গাইগাঁও -এ খুটাঘাট পরগণার বসবাসকারী মানুষ, যারা রাজার সৈন্য ছিল তারাই বারো হাজারি রাজবংশী নামে পরিচিত।

নৃ-গোষ্ঠীগত দিক থেকে রাজবংশী জাতি ঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে কালের ঘোরপ্যাঁচে ধীরে ধীরে রাজবংশী জাতিসত্তার সঙ্গে সংমিশ্রণ হয় বিভিন্ন মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠীর। যেমন — হাজং, জলদা, ধীমাল, থারু, রাভা, মেচ (বোড়ো)। এই মিশ্রণের চিহ্ন কোথাও কোথাও এখনো পাওয়া যায়। যেমন —

মদাসি রাজবংশী ঃ

পশ্চিম অসমে মঙ্গোলীয় জাতি গোষ্ঠীর একটি শাখা মদাসি (অসমিয়া উচ্চারণে মদাহি)

রাজবংশী। রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় আন্দোলনের (১৯০১) পরে ১৯৬৫-৬৬ সালে বারোদলি কমিটি একসঙ্গে জমায়েত হয়ে ক্ষত্রিয় হয়ে রাজবংশী বলে চিহ্নিত হয়েছে।[৪৪]

ড. দীপককুমার রায় আরো যে সমস্ত রাজবংশী জাতির শিকড়ের সন্ধান দিয়েছেন তা এই রকম — হাজং রাজবংশী, জলদা রাজবংশী, দোভাষিয়া রাজবংশী, কোচকাহার বা কাহার রাজবংশী, দেশীয়া রাজবংশী, পলিয়া রাজবংশী, কোচ রাজবংশী, মেচ রাজবংশী। যাইহোক, এতসব বির্তকের মধ্যে না গিয়ে একথা বলা যায় যে, কালের বিবর্তনে মানুষের পরিবর্তন স্বাভাবিক। সেই পরিবর্তনশীলতার প্রবাহে আজকে তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলে আমরা যে সমাজের আলোচনায় ব্রতী হয়েছি তাকে শুধুমাত্র রাজবংশী সমাজ বলে চিহ্নিত করে আলোচনায় অগ্রসর হবো। কেননা, সরকারি দলিল দস্তাবেজে এই সমাজকে সমস্ত শ্রেণি নির্বিশেষে শুধুমাত্র রাজবংশী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঘ) তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকার লোকায়ত জীবন ও লোকসংস্কৃতি ঃ

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকার অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর আগমন ঘটলেও এ অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জনজাতির পরিসংখ্যানের হিসেবে প্রধান জনগোষ্ঠী রাজবংশী সমাজ। তবে এখানকার লোকসংস্কৃতি এককথায় মিশ্র সংস্কৃতি। একদা ভূটানের অধিকারে থাকার ফলে এতদঞ্চলের সংস্কৃতিতে ভূটানের সংস্কৃতির ছাপ লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন স্থান নামের মধ্যে। যেমন — ভোটপাটি, ভোটপাড়া, ভোটের হাট, ভূটানির ঘাট, ভাটিবাড়ি, ভেটাগুড়ি ইত্যাদি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তবে ভূটানি সংস্কৃতির স্থায়ী ছাপ পড়লেও মূলতঃ রাজবংশী অধ্যুষিত এতদঞ্চলের লোকসংস্কৃতিতে রাজবংশী কৃষ্টি সংস্কৃতি প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এখানকার আচার, নৃত্য, গীত, বাক্যে ও জীবন জীবিকায় নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক সমৃদ্ধির লক্ষণটি প্রাধান্য পেয়েছে। একদা বৌদ্ধ প্রভাব বিশেষ কার্যকরী ছিল। ভূটানের দেবরাজ ও ধর্ম রাজারা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ। তবে উচ্চস্তরের ভূটিয়া প্রভাব এই সব অঞ্চলে আদৌ ছিল কিনা সন্দেহ।

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চল তথা উত্তরবঙ্গ এমন একটি অঞ্চল যার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে সমগ্র বাংলার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। বস্তুতপক্ষে, অখণ্ড বাংলার প্রাচীনতম সভ্যতার পীঠস্থান হিসেবে এখানে যে সমস্ত জনপদ গড়ে উঠেছিল, তাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকালের ধারা বেয়ে আজও তা বিদ্যমান। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল যখন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্লাবনে আলোড়িত, তখন তার রেশ উত্তরবঙ্গের সমাজজীবনকেও আন্দোলিত করেছিল। এইসব অঞ্চলে যেমন প্রাক্ আর্যগোষ্ঠীর বাস ছিল তেমনি পরবর্তীকালে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম প্রভৃতি নানা ধর্মগোষ্ঠীর বিকাশ ঘটে। এখানকার সংস্কৃতি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। নানা দেবদেবী সৃষ্টি, দেবদেবীর পূজা, আচার প্রথা, মূর্তি নির্মাণ, শিল্প সৃষ্টি, ব্রত পার্বণ, উৎসব অনুষ্ঠান গুলি এতদঞ্চলের এক মিশ্রিত ও মিলিত সংস্কৃতির পরিচয়বাহী। রাজবংশী, কোচ, মেচ, গারো, রাভা, বোড়ো, পলিয়া প্রভৃতি এবং তার সঙ্গে পরবর্তীকালে ইংরেজ যুগে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অন্যান্য অধিবাসীদেরও বিপুল ভাবে আগমন ঘটে। যেমন সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মানুষ এবং তারাও সঙ্গে করে নিয়ে আসে নিজস্ব রীতি নীতি, আচার পদ্ধতি, ধর্ম-সংস্কার বিশ্বাস। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে অবাধ মিলন ও মিশ্রণের ফলে নানা সংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

সুপ্রাচীন কাল থেকে এতদঞ্চলের উত্তরভাগে লেপচা-ভূটিয়া, সিকিমি, তিব্বতী নেপালিদের বসবাস। এই সব মানুষদের মধ্যে একমাত্র নেপালি ছাড়া আর সকলের মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব কার্যকরী রয়েছে। পাল রাজাদের যুগে এই বৌদ্ধ প্রভাব খুবই বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া মহাযানীদের নানা তন্ত্রমন্ত্র

উপাসনা এখানকার লোকজীবনে খুবই প্রভাব বিস্তার করে। এই বৌদ্ধ সাধকেরা তান্ত্রিক বৌদ্ধ নামে পরিচিত। উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত লোকনাথ মূর্তির বিভিন্ন গঠন পার্থক্যই উত্তরবঙ্গের তান্ত্রিক বৌদ্ধচারের বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। এইসব বিভিন্ন ধরনের শ্রীমূর্তি সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশেষ ভাবে জড়িয়ে আছে।[৪৫] অন্যদিকে কুচবিহার রাজ্যে কোচরাজাদের মধ্যে প্রথমে ছিল শৈবধর্মের প্রভাব এবং পরে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার দেখা যায়। কাজেই বলা যায় সামাজিক নিরবিচ্ছিন্নতার এই ধারা চলেছে যুগের পর যুগ ও বংশানুক্রমে।

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকসাহিত্য তথা লোকসংস্কৃতির শিকড় জড়িয়ে আছে এখানকার জনজাতির জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু এবং সারা বছর ধরে প্রচলিত বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান, ব্রতকর্মকে ঘিরে। এই আচার অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম হল — গমিরা, বিষুয়া, চড়কপূজা, মেছেনি বা ভেদেই, গচিবুনা, ভোগা দেওয়া বা ডাকনী পূজা, চোরচুন্নি, গরুচুমানি, গোরখনাথ পূজা, নয়াখৈ, আষাঢ়ী, বাঁশখেলা, কাদোখেলা, বিশুয়া, আমাতি, বুড়া বুড়ি, গেরামঠাকুর, খেতিলক্ষ্মী, পুষনা, সোনারায় পূজা, ভাণ্ডানী পূজা, যাত্রা পূজা, হাইচাও খেলা, আষাঢ়ী মেলা, কাতিপূজা, জখাজখিনী, ঢ্যালঠাকুর, গছাদেওয়া, মৈপির পূজা, পাগলাপির, কৈপির পূজা ইত্যাদি। এছাড়া সারা বছরের কর্মব্যস্ত জীবন মূলতঃ কৃষি নির্ভর, এই সকল সাধারণ মানুষগুলো মনোরঞ্জনের জন্য দোতরাডাঙ্গা আসর, পালাটিয়া গান, কুশান, যাত্রা, মনোশিক্ষাগান ও এতদঞ্চলের প্রাণ মাতানো মনমজানো ভাওয়াইয়ার আসরের আয়োজন করে। D.H.E. Sunder সাহেব রাজবংশীদের বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর উল্লেখ করেছেন।[৪৬] শস্যের জন্য প্রয়োজনীয় বৃষ্টির কামনায় বিষুব ঠাকুর, আগুনের হাত থেকে রক্ষার জন্য বর্মা ঠাকুর, ফসল রক্ষার জন্য বপনঠাকুর, দুর্ভিক্ষ ও দুর্বিপাকের হাত থেকে ফসল ও মানুষের রক্ষার্থে বসুমতী ঠাকুর, ফসল ও গবাদি পশু বৃদ্ধিতে এবং শিশুর কল্যাণের জন্য বিষহরি ঠাকুরাণী, কলেরার হাত থেকে বাঁচবার জন্য চণ্ডীঠাকুরাণী, ভয় ও ভীতির জন্য কালী ঠাকুরাণী, হিংস্র বন্য জন্তুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য মহাকাল ঠাকুর, এছাড়া গ্রাম ঠাকুর, শিব ঠাকুর, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, ধরম ঠাকুর প্রভৃতি পূজায় কথাও বলেছেন। রাজবংশীদের বিভিন্ন কুসংস্কারের কথাও শুনা যায়, যেমন - জন্মবার ও গুরুবারে বাঁশ কাটতে নেই, তাহলে বাঁশ বন মরে যায়। বাড়ির উত্তর ও পূর্বে তেঁতুল গাছ ও পশ্চিমে তাল গাছ লাগালে অমঙ্গল হয়। কালো বিড়াল ও কালো গাই সৌভাগ্যের প্রতীক। হলদে বিড়াল অমঙ্গল আনে। বসত বাটির ক্ষেত্রেও কিছু সংস্কার রয়েছে। 'পূর্বে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে গুয়া দক্ষিণে ধুয়া।' অর্থাৎ এই ছড়া অনুসারে বসত বাটি নির্মাণ করলে বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে বলে বিশ্বাস। বছরভর বিভিন্ন সময়ে কৃষিকাজের স্তরভেদে এইসব ব্রতানুষ্ঠানে সমাজ মনে দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করেছে।

অনাবৃষ্টিজনিত কারণে কৃষিকর্মের অসুবিধা দূর করতে হুদুমদ্যাও ঠাকুরের পূজো ও তার আনুষঙ্গিক ব্রতকর্মের সৃষ্টি হয়েছে। নদনদীর প্লাবনের প্রাবল্য যেমন মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর অসুবিধা সৃষ্টি করে, ফসলের প্রভূত ক্ষতির কারণ হয় তেমনি জমির উর্বরতা বৃদ্ধিরও সহায়ক হতে পারে। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের প্রচলিত নদীকেন্দ্রিক পূজা অনুষ্ঠানকে কৃষিকৃত্যের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে।

এতদঞ্চলের সমাজ জীবনে গোষ্ঠীচেতনা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। এখানকার সমাজে একটি গ্রামে বিভিন্ন 'টারি' বা মহল্লা আজও দেখা যায় যা গোষ্ঠীবদ্ধ কৌমজীবনের প্রকাশ। যেমন, দেউনিয়াপাড়া, ফেচারটারি, গীদালপাড়া, বাবুপাড়া, কেরানিপাড়া, প্রধানপাড়া, ও কলোনিপাড়া এই সাতটি পাড়া নিয়ে গঠিত হয়েছে পূর্ব দুরামারি গ্রাম। আবার পূর্ব শালবাড়ি গ্রাম গঠিত হয়েছে খালপাড়া, হবিলেরটারি, চাঁদেরডাঙ্গা, কুমোরপাড়া, সূত্রধরপাড়া, বাজারপাড়া নিয়ে। এইরকম পাড়া সংস্কৃতি এতদঞ্চলের সমস্ত জায়গায় পরিলক্ষিত হয়। রাজবংশীদের মধ্যে সম্পন্ন গৃহস্থ যারা তাদের বাড়ি সাধারণতঃ নিজস্ব জমির উপর তৈরি হত। আসেপাশে আবাদী জমি দেখা শুনা এবং চাষ আবাদ করার সুবিধা ভোগ করার জন্য। জোতদার যারা তাদের বাড়ি অবশ্যই বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকত। বাড়ি সাধারণতঃ উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বমুখী হ'ত। বিশ্বাস পশ্চিমদুয়ারী বাড়ি নাকি সর্বনাশ। এ সম্পর্কে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। বাড়ির সামনে সবারই একটা খোলান বা উঠান থাকত। এই উঠানে আবাদী ফসল মাড়াই করার জন্য তোলা হ'ত। এই জোতদার বাড়িকে ঘিরে কৃষক, শ্রমিক আধিয়াররা ঘর করে থাকত। এদেরও ঘরবাড়ির আদল একই রকম। শুধু অভাব ও দারিদ্র্যের ছাপ লক্ষ্য করা যেত, এখনও এই সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

এতদঞ্চলের জীবনযাত্রা গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আর এই গ্রামীণ জীবন মূলতঃ আদিম অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। নিগ্রোজাতীয় মানুষ, নিষাদ জাতীয় মানুষ, দ্রাবিড়ভাষী মানুষ এই ভাবে আমরা এসে পৌঁছই আর্য ভাষা মানুষে। স্রোতধারায়, যাঁরা এলেন রইল তাঁদের পদচিহ্ন। অবশ্য ভাঙনে জলোচ্ছ্বাসে ঝর্নাধারায় অনেককিছু হারিয়েও গেল। এই অঞ্চলের আদিম বনশ্রেণি, গতি পরিবর্তনশীল নদী ও বিভিন্ন জনজাতির প্রবল সংমিশ্রণ সঙ্গম বারবার নতুন করে গড়েছে এখানকার ভয়াল সুন্দর জনজীবনকে। তখন প্রকৃতিই একমাত্র নিয়তি। ফলে বলা যায় নিয়তি শাসিত বা নিয়ন্ত্রিত সমাজে ধর্ম কর্ম ব্রতকথা থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

নেগ্রিটোদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার আজ আর কোন উপায় না থাকলেও একথা বলা যায় তাদের সাংস্কৃতিক স্পর্শ উত্তরবঙ্গের মাটিতে কোথাও না কোথাও

আজও সংগুপ্ত রয়েছে। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, নেগ্রিটোদের কাছ থেকেই উত্তরবঙ্গের জাতি-জনজাতিরা তাঁদের ধর্মবিশ্বাসে-বৃক্ষপূজা-প্রজনন ও উর্বরাশক্তির উপাসনা ইত্যাদি সংস্কৃতির আনয়ন ঘটিয়েছে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের অনেক বিষয়ই অষ্ট্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত। এরাই প্রথম আমাদের দেশে প্রবর্তিত করেছে ধান ও গমের চাষ, এনেছে মৃৎপাত্র তৈরির কৌশল; লাউ-কুমড়ো-বেগুন প্রভৃতি সবজীর চাষ; আখ থেকে চিনি তৈরির কৌশল এরাই আবিষ্কার করেছে। এদের কাছ থেকেই আমাদের জীবনে এসেছে হলুদ ও সিঁদুরের ব্যবহার। এরাই আমাদের শিখিয়েছে হাতী পোষা, শিখিয়েছে সুতী আর সিল্কের কাপড় বোনার পদ্ধতি। কুড়ি কুড়ি গোনার রীতিও এসেছে অষ্ট্রিক-সংস্কৃতি থেকে। লোকজীবনে প্রচলিত নানাপ্রকার 'ট্যাবু' ও এসেছে অষ্ট্রিক জনজীবন থেকে।[৪৭]

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তন্ত্রমন্ত্র যেমন একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। তেমনি বৌদ্ধধর্ম ও তার প্রভাব এতদঞ্চলের সংস্কৃতি সত্তা গঠনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। প্রধানতঃ লামাদের প্রভাবই ছিল এই ধর্মের প্রধান বিশেষত্ব। ভূত-প্রেত, কুসংস্কার, দৈত্য-দানব ইত্যাদি নিয়েই লামাদের কারবার। কবজ-তাবিজ দেওয়া, ব্যাধি দূর করার কাজ ইত্যাদি নানা অতিপ্রাকৃতের কারবারী ছিল এঁরা।[৪৮] তিস্তা ও তোর্ষাপারের লোকজীবনের নানা প্রবাহে এইসব মন্ত্র-তন্ত্র, তুক-তাক, অভিচারক্রিয়া-প্রক্রিয়াদির প্রভাব রয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। এই সমস্ত বৌদ্ধিক ধর্মজাত জাদুবিশ্বাস নিজস্ব সংস্কৃতির ফসলরূপে নানা পূজা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠানে এতদ্অঞ্চলে দেখা যায়। নানা বিচিত্র ধরনের উৎসব, ধর্মীয় আচরণের অঙ্গরূপে ভয়াল মুখোশ, নৃত্য, লোকসঙ্গীত, মন্ত্র ইত্যাদির প্রভাব এখানে স্পষ্ট। এই লোকজীবনেরই ফসলরূপে নানা লোকসঙ্গীত ছড়া ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের কৃষিকথা ও জনপদ নিয়ে বলার আগে সর্বাগ্রে আসে নদীর কথা। কৃষিভিত্তিক সভ্যতায় নদী বিরাট ভূমিকা পালন করে। কৃষির সঙ্গে নদীর সম্পর্ক গভীর। আবার প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান এমনই যে এখানকার নদীগুলি হয় সরু, নাব্যতা থাকে কম। তবে প্রচণ্ড স্রোতধারী পাহাড়ী এই নদীগুলি বর্ষায় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে দুই তীরে অবস্থিত বিস্তীর্ণ জনপদকে প্লাবিত করে। আবার খরস্রোতা নদী সহসা তার গতিমুখ পরিবর্তন করে। (নিকট অতীতে হ্যালিমটন গঞ্জে বসতির উপর দিয়ে কালজানি নদীর গতিপথ পরিবর্তন এখানে স্মর্তব্য।) ফলস্বরূপ, ধূ ধূ বালুভূমি অন্যদিকে ভাঙন — এই দুরবস্থার মধ্যে চাষিকে পড়তে হয়। নদীবহুল এই অঞ্চলের জীবন ও জনবসতি ছিল অনিশ্চিত। একদিকে গভীর অরণ্যের ভয়াল ছায়া, অপরদিকে বান বন্যায় বিভীষিকাময় নিত্যপরিবর্তনশীল

নদী। এর মধ্যে ছোট ছোট সংসার, কৃষিক্ষেত্র ও পশুচারণ। তাই পরিণামে আসে গান, আসে দৈবনির্ভরতা এবং পূজা-পার্বণ এবং আসাটা খুবই স্বাভাবিক। লোক গানের সঙ্গে নদীর তুলনায় ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন — "প্রান্ত উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি এমনই যে নদীগুলি অপ্রশস্ত ও অগভীর হয়। কিন্তু সঙ্গে হয় খুবই খরস্রোতা যে কারণেই নদীগুলি খুব ঘন ঘন, হঠাৎ বাঁক নেয়। সেই Abruptness ধরা পড়ে 'গলাভাঙায়। নদীর এই হঠাৎ হঠাৎ বাঁক নেওয়া প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের সাংস্কৃতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। জলধারা নিম্নগামী বলে স্বতই তা উত্তর থেকে দক্ষিণাভিমুখী হবে; কিন্তু স্বল্প স্থানের মধ্যে বাঁক নিলে জলধারা উত্তরাভিমুখী হবে - বিশেষ স্থানে। যেহেতু উত্তরাভিমুখী জল অস্বাভাবিক, সেইহেতু এই জলের উপর নানা যাদুগুণ আরোপিত হয়। বিশেষ বিশেষ কর্মানুষ্ঠানে সেই জলের ব্যবহার অপরিহার্য।"[৪৯]

শুধু কৃষিভিত্তিক সভ্যতাই নয়। বিশ্বের তাবড় তাবড় নগর সভ্যতাগুলিও গড়ে উঠেছে কোন না কোন নদীর পাশে। লণ্ডন, রোম, প্যারিস, নিউইয়র্ক, বাগদান, মিশর, দিল্লি, পাটনা, কোলকাতা ও আরো নানা নগর মহানগর। আমাদের আলোচ্য বিষয় জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার নদী অববাহিকায়, যেমন — তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, কালজানি, সংকোশ, গদাধর, ডুডুয়া, মানসাই, ধরলা প্রভৃতি নদীসমূহ লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছে তার একটি ছক এখানে দেওয়া হল।

নদীকেন্দ্রিক ব্রত ও পূজা

- মেচেনি
- তিস্তাবুড়ি
- বারুণীস্নান
- সখী স্নান
- অষ্টমী স্নান
  - জগধকা বা বুড়াকর্তা
  - গিলান্ডি বুড়ি (তিস্তাবুড়ির বড় বোন)

কথায় বলে, বাঙালীর বার মাসে তেরোপার্বণ। উত্তর বাংলার কৃষিজীবী জনপদের মধ্যেও পূজা উৎসবাদি কোন অংশে কম নেই। এর মূলে মুখ্যতঃ দুটি কারণ সক্রিয় বলে মনে করেন ড. গিরিজাশঙ্কর রায়, তা হল — "প্রথমতঃ কৃষিকর্মের স্তরগুলিতে একটি হইতে অন্যটির মাঝখানে সাময়িক ভাবে একটি অবসর থাকে। এই অবকাশ যাপনের সুযোগ হইতে নানাবিধ দেবদেবী, পূজা-উৎসব সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদির কল্পনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কৃষিকর্মে প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তা কাটাইবার উদ্দেশ্যে কৃষকের আদিম মানসিকতা স্বাভাবিক ভাবে জাদু নিয়ন্ত্রিত কৃত্যের আশ্রয়

গ্রহণ করিয়াছে। রাজবংশী সমাজের কৃষিকেন্দ্রিক অধিকাংশ পূজা উৎসবাদির মধ্যে জাদু বিশ্বাসের তীব্রতা লক্ষ্য করি।''[৫০] ড. রায়ের এই মত কৃষিকর্মে দৈবনির্ভরতা ধর্ম-কর্ম-ব্রত অনুষ্ঠান ইত্যাদিকেই সমর্থন করে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামঠাকুর তার নির্দিষ্ট স্থানে পূজা পেয়ে আসছেন। এতদঞ্চলের তার ব্যতিক্রম নেই। এখানকার গ্রামঠাকুর বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন ভাবে পূজা পেয়ে থাকেন। এই পূজা সাধারণতঃ কর্ষিত জমি বপণযোগ্য হলে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের দিকে সম্পন্ন হয়। আবার গ্রামে রোগ ভোগ, বাও বাতাস, ব্যারামাদির থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যও এই গ্রামঠাকুরের পূজা নৈবেদ্য হয়ে থাকে। সুতরাং গ্রামঠাকুরের সঙ্গে লোকায়ত জীবনের যোগ খুব নিবিড়। আবার থানশ্রী বা 'থানছিরি' প্রত্যেকটি পরিবারে পরিলক্ষিত হয়। থানশ্রীর সঙ্গে কৃষির ঘনিষ্ঠতা বর্তমান। কেননা, আনুষ্ঠানিক ধান্য রোপণের পর শিষগুলি তার প্রতীক বংশদণ্ডে বেঁধে দেওয়া হয়। সুতরাং বাংলাদেশের পল্লীজীবনের কৃষির সঙ্গে যারা পরিচিত তারা জানেন 'মাঠে হাল চালনার প্রথমদিনে, বীজ ছড়ানোর, শালি ধান বুনবার, ফসল কাটবার বা ঘরে গোলায় তুলবার আগে নানা প্রকারের আচারানুষ্ঠান বাংলার নানা জায়গায় আজও প্রচলিত। এই প্রত্যেক অনুষ্ঠানই বিচিত্র শিল্প সুষমামণ্ডিত। জাতি বর্ণনির্বিশেষে সকলেই এইসব পূজানুষ্ঠানের অধিকারী, মূলতঃ নবান্ন উৎসব বা নতুন গাছের বা নতুন ঋতুর প্রথম ফল বা ফসলকে কেন্দ্র করে যেসব পূজানুষ্ঠান আমাদের মধ্যে প্রচলিত তারমূলেও একই চিত্তধর্মের একই বিশিষ্ট প্রকৃতি সক্রিয়। শুধু কৃষিজীবনকে কেন্দ্র করে নয় শিল্পজীবনেও দেখা যায় এক ধরনের ধর্মানুষ্ঠানের প্রচলন। কিন্তু মূলতঃ এই ধরনের পূজাচারে লোকায়ত সমাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কোন প্রয়োজন পড়ে না। এতদঞ্চলের এইসব গ্রাম্য কৃষি ও কারুজীবনের পূজাচারকে কেন্দ্র করেই বাঙালীর ধর্মকর্ম জীবনের অনেক সৃষ্টির আনন্দ ও উদ্যোগ, শিল্পময় জীবনের অনেক মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য এইসব আচারানুষ্ঠানের অনেক আবহ ও উপাচার আমাদের ভদ্রস্তরের আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে অনুসৃত হয়ে গেছে।

তিস্তা ও তোর্ষাপারের লোকায়ত জীবনে শিব বা শৈবধর্মও বিরাট ভূমিকা পালন করে। এতদঞ্চলের শৈবধাম হিসেবে পরিচিত জল্পেশ মন্দির, জটিলেশ্বর মন্দির, বাণেশ্বর মন্দির একথা প্রমাণ করে। এই অঞ্চলের শৈবধর্মই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অন্যত্র প্রসারিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — "কোচ কৃষক সমাজেই বাংলার লৌকিক শৈবধর্মের প্রথম ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাচীন সাহিত্যেও শিবকে কোচ রমণীদিগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বাংলার সর্বত্র প্রচলিত লৌকিক শিবের ছড়ায় কোচ রমণীর প্রতি শিবের আসক্তির বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।

অতএব, মনে হয় কোচ জাতীয় কৃষকদিগের সমাজেই পৌরাণিক শিব সর্ব প্রথম আসিয়া প্রবেশ লাভ করে। অতঃপর সেখানেই তাহার চরিত্র স্থানীয় কোচদিগের সামাজিক জীবনের উপাদানে মিশ্রিত হইয়া একটি স্থানীয় ও লৌকিক ভাষা পরিগ্রহণ করে। কালক্রমে তাহাই বাংলার সর্বত্র প্রচার লাভ করে।"[৫১]

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে লোকভাষা ও লোকসাহিত্যের দানের কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করা যায়। বোড়ো ও বরো সম্প্রদায়ের যে শাখাটি নেপাল থেকে মেচি নদী পেরিয়ে এ দেশের উত্তর প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে অনেকে মনে করেন তাদেরই মুখে এ অঞ্চলের নাম বাংলা রূপে ভূষিত হয়েছে। সমীক্ষকদের বিশ্লেষণে দেখা যায়, বোড়ো ভাষায় 'হা-বাংলা' দ্বারা এ অঞ্চলটিকে তারা পরিচিত করেছিলেন। তাঁদের মতে 'হা-বাংলা' থেকেই বাংলা শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে।[৫২] বোড়ো ভাষায় 'হা' শব্দের অর্থ জমি বা স্থান। 'বাং' শব্দের অর্থ প্রচুর এবং 'লা' শব্দের অর্থ অধিকার করা। এই ভাবে শব্দটির ইংরেজিতে অর্থ দাঁড়ালো — "possess or occupy as much as you can as there is enough fertile land."[৫৩] মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন কৃষিজীবী এবং এতদ্ অর্থে কৃষি সম্পর্কিত কিছু কিছু শব্দ বড়ো ভাষা থেকে এসেছে বলে দাবি করা হয়। বোড়ো ভাষায় 'নাঙ্গল' (লাঙ্গল), 'লাষ্ঠি' (লাঠি), 'জুঙ্গল' (জোয়াল) , 'যুসলি' (যোয়ালী), মই প্রভৃতি শব্দ এতদঞ্চলের মঙ্গোলয়েড নৃ-গোষ্ঠীয় উত্তরাধিকারকে জোরদার সমর্থন করে। চাষবাস, কর্ষণ, বীজবপণ, ফসল সংগ্রহ ইত্যাদি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিরাট প্রভাব অধিকার করে আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এখন তিস্তা ও তোর্ষা পারের রাজবংশী সমাজ নাঙ্গল, জুঙ্গল (যোয়ালী) শব্দ ব্যবহার করে থাকে।

ড. সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মনে করেন — "J.D. Auderson saw a strong 'Bodo' influence in the growth of Bengali language. He postulated that Bengali syntax and accentuation were influenced by 'Bodo' language." [৫৪]

উত্তরপূর্ব ভারতের মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে জল সম্পর্কিত নানাতর সাংস্কৃতিক প্রবাহ তথা জলবাচকতা হল নিজস্ব মিথ কথা তা তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলেও বিদ্যমান। জল উপাসনা বা নদী উপাসনা এতদঞ্চলের জীবন ধারার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। হয়তো সাংপো বা ডিহং অববাহিকা ধরে নদী পথে এই নৃ-গোষ্ঠী ভারতে প্রবেশ করেছিল বলে এই রূপ জল উপাসনা প্রাধান্য লাভ করেছে। বোড়ো ভাষায় জলবাচক শব্দ দৈ, ডিমাসা ভাষায় দি এবং যার রূপান্তরিত বা কাছাকাছি উচ্চারিত শব্দ তি, তৈ, তোয় ইত্যাদি; যার উৎস দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কোন ভাষা এইমত ভারতীয় ভাষা বিজ্ঞানীদের।[৫৫] এতদঞ্চলের বিভিন্ন নদীর নামের মধ্যে তিব্বত

বর্মীভাষা পরিবারের মিল পরিলক্ষিত হয়।

তিস্তা ঃ

উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ নদী। লিম্বু ভাষায় তিস্তাকে বলা হয় তি-সা-থা, যার অর্থ তোমার সঙ্গে মিলিত হতে চাই। অর্থাৎ লেপচা লিম্বু লোককথা অনুসারে রঙ্গীত (নদী) মিলিত হতে চায় তিস্তা নদীর সঙ্গে। তিস্তা নদী তিস্তা বুড়ি দেবীতে পরিণত এবং তিস্তা বুড়িকে কেন্দ্র করে বৈশাখ মাসে রাজবংশী রমণীরা যে ব্রত পালন করে তা মেচেনি খেলা এবং ভেদেই খেলী নামে পরিচিত। তিস্তার 'তি' এবং ভেদেই খেলীর দেই (< দৈ) জলবাচক প্রত্ন শব্দ।[৫৬]

নিমতি ঃ

পূর্ণ শব্দটি হল নিমতি ঝোরা। এতদ্অঞ্চলের অন্যতম জলধারা। অনেকে মনে করেন 'ঝোরা' শব্দটি কানাড়া 'জরু' (অর্থ সরু জলধারা) থেকে বাংলায় গৃহীত। তবে নিম-তি ঝোরা শব্দে 'তি' জলবাচক।

ডায়না ঃ

এখানকার ফরেষ্ট, চা-বাগান এবং একটি নদীর নাম উৎস দৈ/দোই + না > দৈনা > ডায়না।

তোর্ষা ঃ

জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার অন্যতম নদী। তায়/তোরা + সা (বোড়ো ভাষায় সা অর্থ সন্তান) = জলের সন্তান।

ডুডুয়া ঃ

জলপাইগুড়ি জেলার অন্যতম নদী। উৎস দৈ + দুয়া > দৈদুয়া > ডুডুয়া। ' দৈ শব্দের মানে জল আর 'দুয়া' শব্দের অর্থ প্রবাহ অর্থাৎ ডুডুয়া শব্দের মানে দাঁড়ায় জলের প্রবাহ।

সুতরাং মঙ্গোলীয় ভাষা গোষ্ঠীর প্রভাব, শব্দব্যবহার আদর্শ, প্রথা এবং রীতিনীতির প্রভাব হিন্দু সংস্কৃতির মূলে লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন — "The local Sakta,Saiva and Vaishnava development of Hinduism is Assam and Bengal, are due, partly atleast to the reaction of the early Mongoloides in

North Bihar and to the temperament of the newaries in Nepal and of Bodos,the Ahoms and the khasis in Bengal and Assam."[৫৭] বৈদিক সভ্যতার মহিষ বলি প্রথা প্রসঙ্গে আও-নাগাদের মিথান বা বুনো বাইসন বলি প্রথার কথা বিশেষ ভাবে এই প্রসঙ্গে উঠে আসে।[৫৮] উত্তরবাংলার কোন কোন অঞ্চলে এখনো যে বিচিত্র পদ্ধতিতে দেবতা প্রসাদ সাধন কল্পে পশু উপসর্গ প্রথার প্রচলন আছে, তা এইসব মানুষদেরেই প্রভাব বলে মনে হয়।

তিস্তা ও তোর্ষা অববাহিকা অঞ্চলের লোকায়ত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এতদঞ্চলের লোকজীবনের আদিম ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার প্রক্রিয়া অনুষ্ঠান ইত্যাদি একটি বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। আদিম জীবনাচরণের ক্ষেত্রে ভগবানের প্রাথমিক ধারণা ছিল 'Dynamism' বা 'Power' সম্পর্কিত ধারণা। অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস ও তার প্রসাদার্থে পূজার্চনা ইত্যাদি। তিস্তা ও তোর্ষাপারের মানবগোষ্ঠীর মধ্যে তাই নদী, বন, পাথর ও বৃক্ষপূজা ইত্যাদির অস্তিত্ব দেখা যায়। রাজবংশী মেচ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঘ-কুমীর প্রভৃতি পূজাও দেখা যায়। উত্তরবাংলার বেশিরভাগ নদীই তিস্তা-তোর্ষা, সংকোশ প্রভৃতিকে দেবী বা দেবতারূপে পূজা করা হয়। হিংস্র ও ক্ষতিকর পশুদের হাত থেকে রক্ষার জন্য সোনারায়ের পূজা করে থাকে। মনসা, মহাকাল যেমন পূজা পান, তেমনি পূজা পান গাছও। মেচ সম্প্রদায়ের বাঠৌ নামে পূজিত দেবতা আসলে সীজবৃক্ষ। তেমনি মইনাও রূপে পূজিত শক্তির প্রতীক লক্ষ্মীদেবী আসলে মৃত্তিকা দেবীর উপর স্থাপিত অলংকৃত বাঁশ। রাজবংশী সমাজের সন্ন্যাসী পূজা, বিষহরি পূজা, ধরমঠাকুর পূজা, মদনকাম পূজা, মেচেনি খেলা অনুষ্ঠান এবং নানা আনুষ্ঠানিক পূজা প্রচার প্রথা ইন্দো-মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির দান। "লোকায়ত বিশ্বাস "every tree is a sort of emblem of life".[৫৯] সুতরাং বৃক্ষকে সন্তুষ্ট করার প্রথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বৃক্ষপূজা নানাভাবে এতদঞ্চলে প্রচলিত। বাঁশখেলা উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের এই রকমই এক পূজা বিশেষ।

ড. নীহাররঞ্জন রায় মঙ্গোলীয় প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন — কোচ, পলিয়া রাজবংশী প্রভৃতি লোকেদের ভিতর ইহার একটি ধারা প্রবাহ ধরা পড়িয়া গিয়োছে। .... ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাধৃত ধারাটির একটি প্রবাহ ঐতিহাসিক কালে বাংলাদেশে আসিয়া ঢুকিয়া পড়ে, এবং রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে এই ভাবেই খানিকটা মঙ্গোলীয় প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।[৬০]

এই মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিই মূলতঃ উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি রূপে পরিচিত। অবশ্য এর সঙ্গে প্রাক্ আর্য কোল, ভীল, মুণ্ডা, পুলিঙ্গ প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির ও মিশ্রণ আছে, তবে উত্তরবঙ্গের লোকসমাজে রাজবংশী কোচ, মেচ, গারো, রাভা, পলিয়া প্রভৃতি প্রভাবেই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বৃক্ষ, পাথর ফুল, ফল, পাহাড়, নদী, পশু, পক্ষী, কিংবা বিশেষ স্থানে পূজা

এগুলি প্রাক্ অর্থ লোকজীবনেই বিশিষ্ট সংস্কৃতি। আধিবাসীদের কৃষি ও বিশেষ প্রজনন শক্তির পূজা, বিশেষ বিশেষ টোটেম ও ট্যাবো, গুহ্য জাদু শক্তির পূজা, আরো নানা সামাজিক প্রথা স্ত্রী আচার ব্রত ইত্যাদি আমাদের এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বিহার ছোটনাগপুর, রাঁচী প্রভৃতি নানা অঞ্চল থেকে নানা শ্রেণির আদিবাসী উত্তরবঙ্গে আসেন। কোচ, মেচ, গারো, রাভা, দেশি, পলিয়া, টোটো প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বাস করতে থাকেন সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ প্রভৃতি নানা শ্রেণির আদিবাসি। তারাও নিজস্ব আচার-বিশ্বাস, রীতি-প্রথা অনুষ্ঠান সঙ্গে করে আনেন, সেই সঙ্গে নিজস্ব ছড়া, লোকগান, লোককথা, প্রবাদ ইত্যাদি ইংরেজ আমলে চা-বাগান ও আনুষঙ্গিক কলে-কারখানায় কাজ করার জন্যও আদিবাসী এসেছিলেন। কালক্রমে তাঁরা উত্তরবঙ্গের জনগোষ্ঠীরূপে পরিগণিত হয়ে গেছেন। জীবনের সূচনা থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠান রীতি প্রথা ইত্যাদির মধ্যে লোকজীবনের বিচিত্র সংস্কৃতির পরিচয় ছড়ানো আছে। ছড়া, প্রবাদ, লোকগান, ধাঁধা, লোককথা, ব্রত অনুষ্ঠান, মন্ত্র-তন্ত্র, নানা উৎসব অনুষ্ঠানগুলির আচার পদ্ধতির মধ্য থেকে সেই সংস্কৃতির অনুসন্ধান সম্ভব।

তথ্যসূত্র ঃ

১. দত্ত, সব্যসাচী - উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ৭ই অক্টোবর, ২০০৭।

২. দাস, সুকুমার - উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, ১৯৮২, পৃ. ১৫।

৩. দাস, সুকুমার - উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, ১৯৮২, পৃ. ১৬।

৪. ঐ, - পৃ. ১৮।

৫. ঐ, - পৃ. ১৮।

৬. ঐ, - পৃ. ১৯।

৭. ঐ, - পৃ. ২৭-২৮।

৮. রায়, নীহাররঞ্জন - বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), পৃ. ৩৪।

৯. কর, অরবিন্দ (সম্পাদক) - কিরাত ভূমি, শীত সংখ্যা, ২০১০, পৃ. ৬৮।

১০. ঐ, - পৃ. ৬৭।

১১. West Bengal District Gazzetteers, Jalpaiguri, 1981, p.1.

১২. কর, অরবিন্দ (সম্পাদক) - কিরাত ভূমি, শীত সংখ্যা, ২০১০, পৃ. ৬৮।

১৩. ঐ, - পৃ. ৬৯।

১৪. Sunyal, Dr. Charu Chandra - The Meches and the Totes two sub-Himalayan Tribes of North Bengal, 1973, p. 1.

১৫. West Bengal District Gazzetteers, Jalpaiguri, 1981, p. 48.

১৬. ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পাদিত) - মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৩৯৪, পৃ. ২৩।

১৭. পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ২০০৬, পৃ. ৩৬।

১৮. ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পাদিত) - মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৩৯৪, পৃ. ৩১।

১৯. ঐ, - পৃ. ৩৩।

২০. ঐ, - পৃ. ৩২।

২১. West Bengal District Gazzetteers, Jalpaiguri, 1981, p. 36.

২২. ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পাদিত) - মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৩৯৪, পৃ. ৩৬।

২৩. পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ২০০৬, পৃ. ৪৩।

২৪. ঐ, - পৃ. ৪৩।

২৫. ঐ, - পৃ. ৪৩।

২৬. ঐ, - পৃ. ৪৩।

২৭. রায়, ড. দীপককুমার (সম্পাদক) - 'স্মরণিকা' ২১তম রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা ও উত্তরবঙ্গ মেলা ২০১০, পৃ. ২৩।

২৮. সরকার, ড. ইছামুদ্দিন (সম্পাদিত) - ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ২০০২, পৃ. ৮৭।

২৯. Hunter, W. W. - Statistical Account of Bengal, Vol - X, p. 402.

৩০. Risely, H. H. - The Tribes and Caste of Bengal, Vol - I, p. 491.

৩১. সরকার, ড. ইছামুদ্দিন (সম্পাদিত) - ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ২০০২, পৃ. ৮০।

৩২. ঐ, - ৮০।

৩৩. রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতি পূজা-পার্বণ, ভূমিকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৯।

৩৪. রায়, নীহাররঞ্জন - বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), পৃ. ২৪।

৩৫. রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর - উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতি পূজা-পার্বণ, ভূমিকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৯।

৩৬. Chatterjee, Dr. S. K. - The Origin and Development of Bengali language, Part - I, p. 69.

৩৭. সরকার, ড. ইছামুদ্দিন (সম্পাদিত) - ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ২০০২, পৃ. ৮১।

৩৮. Grunning, J. F. - Eastern Bengal & Assam District Gazetters, Jalpaiguri, 1911, Reprint - 2008, p.46.

৩৯. ঐ, - পৃ. ৪৫।

৪০. People of India Assam, 2003, Anthropological Survey of India, Calcutta, p. 695.

৪১. রায়, ড. নিখিলেশ (সম্পাদিত) - ডেগর, ২০০৬, 'রাজবংশী সমাজের গোড়াশির কাথা ঃ ড. দীপককুমার রায়', পৃ. ৬৫।

৪২. Basu, Dr. Swaraj - Dynamics of a caste movements - The Rajbansis of North Bengal, 1910-1947, New Delhi-64, 2003, p. 65.

৪৩.	রায়, ড. নিখিলেশ (সম্পাদিত)	-	ডেগর, ২০০৬, 'রাজবংশী সমাজের গোড়াশির কাথা ঃ ড. দীপককুমার রায়', পৃ. ৬৬।
৪৪.	ঐ,	-	পৃ. ৬৮।
৪৫.	ভট্টাচার্য, শ্রীসুশীলকুমার	-	উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, পৃ. ২৭।
৪৬.	ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পাদক)	-	মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৩৯৪, ডি. এইচ. ই. সান্ডারের প্রতিবেদন, ড. পবিত্রকুমার গুপ্ত, পৃ. ৯৫।
৪৭.	দাস, সুকুমার	-	উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, ১৯৮২, পৃ. ১৭।
৪৮.	সরকার, ড. ইছামুদ্দিন (সম্পাদিত)	-	ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ২০০২, পৃ. ৮৫।
৪৯.	ভৌমিক, ড. নির্মলেন্দু	-	ভাওয়াইয়া গানের কথা, ২০১০, পৃ. ১৮১।
৫০.	রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর	-	উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতি পূজা-পার্বণ, ভূমিকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৭।
৫১.	ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ	-	বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ১০৪।
৫২.	সরকার, ড. ইছামুদ্দিন (সম্পাদিত)	-	ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ২০০২, পৃ. ৭৯।
৫৩.	সরকার, ড. ইছামুদ্দিন (সম্পাদিত)	-	ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ২০০২, পৃ. ৭৯।
৫৪.	Chatterji, Sunity Kr.	-	The Origin and Development of the Bengali language, 1926, reprint, 1986, Part - I, p.70.
৫৫.	ভট্টাচার্য, ড. দেবাশিস	-	তরস্বী, ২০০৭, 'তি, তৈ, দৈ ইত্যাদি ঃ জলবাচক প্রত্নশব্দ ও প্রত্যয় - একটি সমীক্ষা ঃ ড. দীপককুমার রায়, পৃ. ৩৮।
৫৬.	ঐ,	-	পৃ. ৩৯।

৫৭. Chatterji, Dr.S. K. - Kirat-Jana-Kriti, 1951, reprint-1998, p. 53.

৫৮. সরকার, ড. ইছামুদ্দিন (সম্পাদিত) - ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ২০০২, পৃ. ৭৯।

৫৯. ঐ, - পৃ. ৭৮।

৬০. রায়, নীহাররঞ্জন - বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), ২০০১, পৃ. ৩৪।

****